শ্রীসুনীলকুমার মণ্ডল

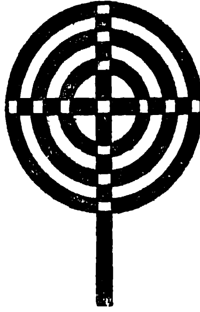
ও

শ্রীমতী শান্তি মণ্ডলের

করকমলে

এই লেখকের অন্যান্য বই

বারমুডা ট্রাঙ্গল
আবার বারমুডা ট্র্যাঙ্গল
প্ল্যানেট মিস্ট্রি
পিরামিড রহস্য
ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা
সিক্রেট স্পাই



অনেক অনেক দিন আগে, এই মোটামুটি বারো হাজার বছর আগে যখন মধ্য প্রাচ্যে সভ্যতার উন্মেষ হয় নি তারও আগে কি দুই মহাদেশের মাঝে আটলানটিক মহাসমুদ্রের বুকে কোথাও কি একটা বিরাট দ্বীপ বা দেশ ছিল যার নাম আটলানটিস ?

সে দেশ ছিল নাকি সুসভ্য। এই সুসভ্য আটলানটিস নামে দেশটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন, কেউ করেন না। কিন্তু এই দেশ এখনও আলোচনার বিষয় হয়ে রয়েছে। আটলানটিক নিয়ে কম করে কুড়ি হাজার বই ও প্রবন্ধ বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে। কোনো একটি বিষয়ের ওপর এত বেশি বই বা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

আটলানটিকের নাম আমাদের প্রথম শুনিয়েছিলেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। খ্রীস্ট জন্মের প্রায় চারশ' বছর আগে তাঁর লেখা টিমিয়াস গ্রন্থে এই দেশের উল্লেখ ছিল। ইজিপ্টের একজন পুরোহিত, বিধানকর্তা সোলনকে যেন এই দেশের কাহিনী শোনাচ্ছেন, এইভাবে প্লেটো লিখেছিলেন :

সোলন, সোলন, তোমরা গ্রীকরা সকলেই শিশু, গ্রীসে একজনও বৃদ্ধ নেই। তোমাদের কোনো ঐতিহ্যও নেই, তোমরা শুধু একটা মহাপ্লাবনের

কথাই জান যে প্লাবনে তোমরা জান মানুষের বিরাট ক্ষতি হয়েছিল, প্লাবনের সঙ্গে আগুনও যোগ দিয়েছিল। একমাত্র ইজিপ্ট বেঁচে গিয়েছিল আর একমাত্র ইজিপ্টেই লিপিবদ্ধ আছে সেই প্রাচীন ইতিহাস; তোমরা তোমাদের নিজের অতীতই জান না।

ডিউক্যালিয়নের অনেক আগে, নয় হাজার বছর আগে, সাইস-এর মতো এথিনা এথেন্স স্থাপন করেছিলেন, শক্তি ও জ্ঞানে সে শহর ছিল সমৃদ্ধ, নানা কীর্তির জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছিল, যার তুলনা পাওয়া যায় না। সেই সময়ে হারকিউলিসের স্তম্ভের বিপরীতে আটলানটিকে একটি দ্বীপ ছিল, যে দ্বীপ ছিল একত্রে লিবিয়া ও এশিয়া অপেক্ষা বড়, যে দ্বীপের বন্দরে নাবিকেরা নৌকো বেয়ে যেত এবং সেই দ্বীপ থেকে অন্যত্র। দ্বীপের ওধারে সমুদ্রে এক প্রণালীতে ছিল বন্দর। সমুদ্র যে দ্বীপকে ঘিরে ছিল সে দ্বীপকে মহাদেশ বলা যায়। এই দ্বীপের নাম আটলানটিস। সে দেশ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, সে দেশের রাজারা ছিল পসিডনের বংশধর, সেই মহাদেশের একাংশ এবং অনেক দ্বীপের ওপর রাজার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। এমন কি মিশরের দ্বার পর্যন্ত লিবিয়া এবং টিরেনিয়া পর্যন্ত ইউরোপ ছিল এই মহাদেশের অধীন। তখন যেসব দেশের অস্তিত্ব জানা ছিল সেসব দেশের ওপরও আটলানটিস আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করত।

তারপর শোনো সোলন, সেই দেশের শক্তি ও সাহসের পরিচয় সব দেশ টের পেয়েছিল, সে একাই লড়াই করে শত্রুকে পরাজিত করত। তারপর একদিন এলো মহাপ্লাবন, সঙ্গে ভূমিকম্প, সব দেশ ডুবে গেল, আটলানটিস কোথায় তলিয়ে গেল। তারপর এই সমুদ্রের ওপর দিয়ে তরণী চালানো যায় না, জায়গাটা কাদায় ভরে গেছে।

প্লেটো আরও একটা বই লিখেছিলেন। সেই বইয়ের নাম ক্রিটিয়াস। এই বইতে তিনি লিখেছেন খ্রীস্টপূর্ব ৯৬০০ বছরে আটলানটিস ডুবে যায়। আটলানটিসের মন্দির, প্রাসাদ, সেতু, খাল এবং দেশের সমুদ্রের তিনি বর্ণনা করেছেন। প্লেটো লিখেছেন বারোটি দ্বীপ নিয়ে ছিল এই দেশ, প্রতি দ্বীপ শাসন করত একজন স্বাধীন রাজা। দেশের লোকেরা ছিল ভদ্র,

তারা আইন মানত। প্লেটো লিখেছেন :

নগর দুর্গের ভেতরে কেন্দ্রস্থলে থাকত ক্লিটো এবং পসিডনকে উৎসর্গ করা পবিত্র এক মন্দির, মন্দিরে প্রবেশ করা ছিল দুঃসাধ্য, সোনার প্রাচীর মন্দির ঘিরে রাখত। পসিডনের নিজস্ব মন্দিরও ছিল যার জাঁকজমকের তুলনা নেই। মন্দিরের চুড়োগুলি সোনা ও রুপো দিয়ে মোড়া। মন্দিরের গম্বুজের ভেতর হাতির দাঁতের কাজ করা হ'ত। মন্দিরের থাম, মেঝে ইত্যাদি সোনা, রুপো ও মূল্যবান প্রস্তর খচিত, অপূর্ব কারুকাজ। মন্দিরে থাকত দেবতার বিরাট মূর্তি। সোনার তৈরি। ছটি পক্ষিরাজের রথে দেবতা থাকতেন। সে মূর্তি এত বড় যে প্রায় মন্দিরের ছাদ পর্যন্ত মাথা পৌঁছত। মূর্তির চারদিকে ডলফিন বাহিত শত শত পরী সাজান থাকত। মন্দিরের বাইরে দশজন রাজা ও রাণীর সোনার মূর্তি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। রাজারা এবং দেশের লোকেরাও মন্দিরে পূজা দেবার সময় অনেক মূল্যবান সামগ্রীও দান করত।

প্লেটোর এই কাহিনী অনেকে বিশ্বাস করেন না। প্লেটোর সময় পৃথিবী ছিল অনেক ছোট। এশিয়া বলতে মানুষের জ্ঞান ছিল এশিয়া মাইনর পর্যন্ত। উত্তর আফ্রিকা ব্যতীত আফ্রিকার বাকি অংশের কথা তারা জানত না। অ্যামেরিকার কোনো কল্পনা তাদের মাথায় আসে নি। তবে সে যুগে ভারতীয়, ফিনিশিয়, মিশরীও বা গ্রীক নাবিকেরা সমুদ্রে পাড়ি দিত। তারা আটলানটিক সমুদ্রেও পাড়ি দিত।

সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দেশে ফেরবার পথে বা দেশে ফিরে এরা সত্য মিথ্যা মিলিয়ে নানা কাহিনী বলত। তারা কেউ হয়ত আটলানটিসের অস্তিত্বের কথা শুনেছিল, শুনেছিল যেখানে অগভীর সারগাসো সি, সেইখানেই নাকি ছিল আটলানটিস যে আটলানটিসের শৌর্য ও ঐশ্বর্য ছিল নাকি অতুলনীয়।

গ্রীকরা মনে করত সমুদ্রের ওপারে বাস করে অন্ধকারের রাজত্বে সিমেরিয়ানরা। সে দেশে আলো নেই। তারা বলত আটলানটিকে কোথায় নাকি আইল্যাণ্ড অফ ব্লেস্ট নামে আশ্চর্য এক দেশ আছে। হারকিউলিস নাকি

সমুদ্রের ওপারে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে কত গল্প করেছেন। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে থিওপমপাস নামে গ্রীক ঐতিহাসিক ইউরোপ ও আফ্রিকার মাঝে বিশাল এক দেশের বিবরণী লিখেছেন। ইউলিসিস তো কত দেশের কথাই বলেছে এমন কি ল্যাণ্ড অফ লোটাস ইটারস-এর কথাও বলেছেন যা হয়তো আজকের হাওয়াই দ্বীপ। সবই কি অলীক ?

পেরু, ইউকেটন ও মেকসিকোর প্রাচীন সভ্যতার অনেক কীর্তি আছে। পণ্ডিতেরা বলেন এই দেশগুলিতে সভ্যতার বিস্তার হঠাৎ হয়েছিল। অন্য দেশের মানুষ ঐসব দেশে গিয়ে সভ্যতার পত্তন করেছিল, তাদের কৃষিকাজ শিখিয়েছিল, শিখিয়েছিল বাড়ি তৈরি করতে।

মধ্য আমেরিকা ও পেরু যে একদা ঐশ্বর্যশালী ছিল সে কথা প্রথম শোনা যায় পিজারো প্রমুখ দুঃসাহসী ভ্রমণকারীদের মুখ থেকে। তারপর পুরাতত্ত্ব-বিদরা সে দেশে গিয়ে সেইসব দেশের অধিবাসীদের কাছে শোনেন যে হাজার বছর আগে তারা মোটেই সভ্য ছিল না কিন্তু নৌকো চেপে হঠাৎ কোথা থেকে দাড়িওয়ালা অনেক সাদা ও লাল মানুষ তাদের দেশে এসে তাদের কৃষিকাজ, পশুপালন, বাড়ি তৈরি, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র, বস্ত্র তৈরি, এসব শেখায়। তারা পিরামিডের মতো বড় বড় মন্দির তৈরি করত।

পণ্ডিতেরা বলেন আটলানটিস ধ্বংস হবার মুখে যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা ঐসব দেশে গিয়ে সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ভারতের রাজা মান্ধাতার কথা শোনা যায়। মধ্য আমেরিকাকে মান্ধাতা বলতেন রসাতল। সেই রসাতল তিনি জয় করে সভ্যতার বিস্তার করেন।

আটলানটিসের মানুষেরা নাকি এদিকে লিবিয়া ও স্পেনে বসতি স্থাপন করেছিল।

আর একদল পণ্ডিত বলেন আটলানটিস ধ্বংস হয়েছে দশ হাজার বছর আগে কিন্তু মধ্য আমেরিকা ও পেরুর সভ্যতা অত প্রাচীন নয়। তাদের সভ্যতা স্থাপিত হয়েছে যীশুর জন্মের মাত্র কয়েকশত বছর পূর্বে।

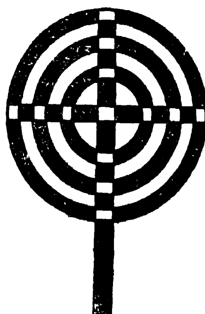
আবার অনেকে বলেন আমেরিকায় আগে মানুষই ছিল না। এশিয়ার মোঙ্গল জাতির মানুষেরা বেয়ারিং স্ট্রেট পার হয়ে আলাস্কার ভেতর দিয়ে

আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। তারাই দুই আমেরিকায় সভ্যতার গোড়াপত্তন করে।

মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতা খুব প্রাচীন। জ্যোতির্বিদ্যা তারা উত্তমরূপে জানত। তারা জানত ৩৬৫ দিনে এক বছর হয়, চার বছর অন্তর লিপইয়ার হয়, কবে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হবে তা তারা বলতে পারত। মহাপ্লাবনের কথা তারাও জানত। এসব বিদ্যা তারা কাদের কাছে শিখেছিল। আটলানটিসের মানুষ নাকি এশিয়ার মানুষ? অথচ মধ্য আমেরিকা লোহার ব্যবহার জানত না, চাকা কি তাও তারা জানত না অথচ এ দুয়ের ব্যবহার পুরনো পৃথিবীর মানুষ অনেক আগেই শিখেছিল। এও এক রহস্য।

আমেরিকা ও ইউরোপের মাঝখানে আটলানটিক সমুদ্রে কোথাও আটলানটিক ছিল বলে যারা বিশ্বাস করে তারা বলে অনেক রকম গাছপালা ও পশুপাখি আটলানটিক মহাসমুদ্রের দুই পারেই দেখা যায়। অথচ পেরুর আলু এবং মেকসিকোর টম্যাটোর অস্তিত্ব পুরনো পৃথিবীর লোক জানত না।

বারমুডা থেকে স্পেন পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরতা নাকি নির্দেশ করে এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এক মহাদেশ ছিল। সেই দেশে যে সব পাহাড় ছিল তার এক একটি চূড়া আজও দ্বীপ রূপে বিরাজ করছে। অ্যাজোরস এবং অন্যান্য দ্বীপ সেই সব পাহাড়ের চূড়ো।



মানুষ একদিকে তীরবেগে এগিয়ে চলেছে। চাঁদে তো কবেই পৌঁছে গেছে, এখন মহাকাশে বিচরণ করছে। সেই সঙ্গে মানুষ পিছনে ফিরেও দেখছে।

অতীতে কি ছিল তারও খোঁজ খবর নিতে হচ্ছে। পাহাড় পর্বত, মরুভূমি, বনজঙ্গল এমন কি সমুদ্রের গভীরেও সে প্রবেশ করে হাতড়ে বেড়াচ্ছে কোথায় কি পাওয়া যেতে পারে।

একেবারে নিরাশ হচ্ছে না—পাচ্ছেও কিছু। খোঁজা কোনোদিন শেষ হবে না, হতে পারেও না। ফ্লাইং সসার অ্যাবমিনেবল স্নোম্যান বা বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্য জানতে মানুষ যেমন সচেষ্ট তেমনি সচেষ্ট পিরামিডের রহস্য এবং হারিয়ে যাওয়া দেশ আটলানটিসের রহস্য জানতে।

মানব সভ্যতার বিকাশ সর্বপ্রথমে কোথায় হয়েছিল ? মহেঞ্জোদড়ো, মিশর, চীন, সুমেরিয়া নাকি ককেশাসে ?

প্রাচীন কোনো সামগ্রীর বয়স নিরূপণ করতে বিজ্ঞানী কার্বন ফোরটিন পদ্ধতির আশ্রয় নেন। এই পদ্ধতি দ্বারা ফসিল গাছ বা পাথরের বয়স ধরা যায়। আদি মানুষদের ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী বা সেই সময়ের গাছের ফসিল, মাটি, পাথর পরীক্ষা করে যা জানা যাচ্ছে তা অন্য কথা বলছে।

আমরা জানি উপরোক্ত কোনো একটি দেশে মানব-সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে তা নয়। এদেরও আগে আর একটা দেশ সভ্য হয়েছিল এবং সেই সভ্যতা অবলুপ্ত হয়ে যাবার পর নাকি মিশর, সুমেরিয়া সভ্য হয়েছিল। ঐ অবলুপ্ত দেশই নাকি মিশর ও সুমেরিয়াকে সভ্য করেছিল।

অবলুপ্ত সেই দেশটির নাম আটলানটিস। সেই দেশ নাকি আটলানটিক মহাসমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেছে। সেই সুপ্রাচীন দেশের নগর বন্দরের কিছু অংশ মহাসমুদ্রের নিচে এখনও ডুবে আছে, পূর্ব ও পশ্চিম আটলানটিকে এখনও কিছু নিদর্শন বেঁচে আছে। আটলানটিকের মাঝখানেও নাকি কিছু পাওয়া গেছে।

আটলানটিসের প্রথম বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শনটি প্রথম আবিষ্কার করেন ডঃ ম্যানসন ভ্যালেন্টাইন ১৯৬৮ সালে। "বিমিনি রোড"-এ ডুব দিয়ে তিনি পান ভিৎ সমেত পাথরের একটি পাঁচিল, রাস্তা, পাথরের জেটি যেখানে পালতোলা জাহাজ ভিড়ত। বেশি গভীরে নয়, মাত্র তিরিশ ফুট আন্দাজ

নিচে এগুলি পাওয়া যায়।

কয়েকজন বিজ্ঞানী বিশ্বাস করলেন না। তাঁরা বললেন এগুলি সমুদ্রের কিনারারই পাথর, জলস্রোতে ক্ষয়ে বড় বড় ব্লকের মতো দেখাচ্ছে। অন্য কোথাও খুঁজলেও এমন চৌকো পাথর দেখা যাবে।

পাথরগুলো জলে ক্ষয়ে চৌকো হয়েছে স্বীকার করেছেন কিন্তু জলে ক্ষয়ে পাথরগুলো গোল, ডিম্বাকৃতি, বা ত্রিকোণ না হয়ে চৌকো হলো কি করে? শুধু একটা দুটো চৌকো পাথর নয়, এমন কয়েকটা চৌকো পাথর রয়েছে যেগুলোর আকার ও ওজন প্রায় সমান এবং সেগুলো ওপর নিচে বা পাশাপাশি সাজানো যায়।

শুধু কয়েকটা চৌকো পাথর নয়, পাথরের কয়েকটা থামও পাওয়া গেছে। তারপর পাথরের জেটি ও পাথরের রাস্তা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। খানিকটা জলের ওপরেও উঠে গেছে।

ভ্যালেন্টাইন যাকে বিমিনি রক বলেছেন সেটি হলো বিমিনি দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। বিমিনি দ্বীপ ফ্লোরিডা উপকূল এবং মিয়ামি থেকে বেশি দূরে নয়। এই বিমিনি দ্বীপের আশেপাশে বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যা হয়ত আটলানটিসেরই ধ্বংসাবশেষ। বিমানের পাইলটরাও নাকি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত পাথরের পাঁচিল এবং বিরাট খিলান দেখেছে।

বাহামা দ্বীপপুঞ্জ অন্তর্ভুক্ত অ্যানড্রস দ্বীপে ও কাছে বাহামা ব্যাংকস-এ সমুদ্রের নিচে এমন কিছু দেখা গেছে যা একদা কোনো প্রাসাদ বা দুর্গের অংশ ছিল।

ঐসব অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের যে ফসিল পাওয়া গেছে তার বয়স দশ থেকে বারো হাজার বছর।

সমুদ্র যখন নিস্তরঙ্গ ও শান্ত থাকে, জল যখন পরিষ্কার থাকে তখন ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে যে সব বড় বড় পাথরের চাঙড় দেখা যায় সেগুলি এলোমেলো কিছু নয়। ইউকেটান ও ব্রিটিশ হনডুরাস অঞ্চলে, কিউবার কাছে সমুদ্রগর্ভে যা কিছু দেখা গেছে তা দেখে পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন, দুর্গ, দেওয়াল বা বাঁধের ধ্বংসাবশেষ। সবই দেখা গেছে সমুদ্রের নিচে তিরিশ

থেকে দু'শো ফুট গভীরে। এইসব অঞ্চলে সমুদ্রের ধারে যে সব পাথর পাওয়া যায় আর সমুদ্রের নিচে যেসব পাথর পাওয়া গেছে, এই দুইয়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা গেছে। তবে স্থানীয় পাথর যেমন কিছু ব্যবহার করা হয়েছে তেমনি অন্য জায়গা থেকেও অন্য জাতের পাথর আনা হয়েছে।

আরও দক্ষিণে ভেনেজুয়েলার কাছে সমুদ্রে ১০০ ফুট লম্বা একটা পাথরের পাঁচিলের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে। কিউবার উত্তরে সমুদ্রের নিচে প্রায় দশ একর জায়গা জুড়ে কতকগুলি বাড়ির সমষ্টি পাওয়া গেছে। সেগুলি অবশ্য খাড়া দাঁড়িয়ে নেই, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেগুলি বাড়ি বলে চেনাও মুশকিল কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদরা এগুলি বাড়ি বলেই সনাক্ত করেছেন। এই আবিষ্কারটি করেছেন রাশিয়ান পুরাতত্ত্ববিদরা। আটলানটিস নিয়ে তাঁরা বর্তমানে গবেষণা করেছেন। এজন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করেছেন।

পশ্চিম আটলানটিক এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে অগভীর সমুদ্রে, এই তিরিশ থেকে দুশো ফুট গভীরতায় এই সব ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে। আটলানটিস অতি প্রাচীন সভ্যতা বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু এই সভ্যতার বিষয় অনেক লেখালেখি হলেও মূল উৎস নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়েছে মাত্র ১৯৬৫ সাল থেকে। যাকে বলে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ সেই কাজ আগে হয় নি অথচ অন্য প্রাচীন সভ্যতার প্রমাণ অনুসন্ধানে কবেই না কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। কারণ কি?

যে অঞ্চলে প্রাচীন আটলানটিসের অধিকাংশ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাচ্ছে বলে বিশ্বাস সেই অঞ্চলটি পুরোপুরি বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের সীমানার মধ্যে পড়ছে। এ কথা আজ কারও অজানা নয় যে এই বারমুডা ট্র্যাঙ্গেল এলাকায় বহু জাহাজ, মানুষ, এমন কি বিমান রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে।

তিরিশ বছর হলো ব্যাপারটা ধরা পড়েছে। তার আগেও অনেক জাহাজ, নৌকো ডুবেছে কিন্তু হঠাৎ কারও খেয়াল হলো এই এলাকায় এত যে জাহাজ নিরুদ্দেশ হচ্ছে এর কারণ কি? তিনি হয়তো কাগজে চিঠি বা প্রবন্ধ

লিখলেন আর সেই দিন থেকে ঐদিকে সকলের নজর পড়ল।

যে সব জাহাজ ডোবে নি বা প্লেন হারিয়ে যায় নি তাদের ক্যাপটেন বা পাইলটরা বলে যে ঐ এলাকায় হঠাৎ কম্পাস বিকল হয়ে যায়, রেডিও বন্ধ হয়ে যায়, রাডার পর্দায় কিছু দেখা যায় না, ইলেকট্রনিক কোনো যন্ত্র কাজ করে না। চারদিক ঘন সাদা কুয়াশায় ভরে যায়।

হঠাৎ যেমন এই বিশৃংখলা দেখা দেয় তেমনি হঠাৎই আবার শৃংখলা ফিরে আসে। এর কারণ কি ? কেউ উল্লেখ করলেন যে মায়া নামে খ্যাত সভ্যতার শক্তির উৎস ছিল স্ফটিক। সাধারণ স্ফটিক নয় নিশ্চয়। মায়া সভ্যতার জনক যদি হয় আটলানটিস তাহলে সেই সুপ্রাচীন সভ্যতারও শক্তির উৎস নিশ্চয় ছিল স্ফটিক।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেল এলাকায় জলের নিচে কোথাও কি তেমন একটা স্ফটিক স্তম্ভ লুকিয়ে আছে ? যার শক্তি আজও নিষ্প্রভ হয় নি ? যে শক্তি এই বিপর্যয় ঘটাচ্ছে ?

কিন্তু আটলানটিস মহাদেশ কি এখানেই ছিল ? তার উত্তরও ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। সে কথায় পরে আসছি।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের মতো আটলানটিসও এক রহস্য। আচ্ছা সেই প্রাচীন দেশের মানুষেরা কি সে দেশকে আটলানটিস বলত ? সম্ভবতঃ বলত কারণ অনুরূপ নামের পাহাড়, দ্বীপ ইত্যাদি আছে। আটলানটিসের নাম প্রথম শোনা যায় প্লেটো লিখিত বই দুখানি থেকে, সে কথা আগেই বলেছি।

প্রাচীন ইতিহাসেও আটলানটিসের অনুরূপ নাম পাওয়া যায়। সে যুগের ওয়েলসবাসী ও ইংরেজরা বিশ্বাস করত পশ্চিম সমুদ্রে কোথাও একটা স্বর্গরাজ্য আছে যে স্বর্গরাজ্যের নাম আটালান। প্রাচীন গ্রীকরা অবশ্য সেই দেশকে বলত আটলানটিস। ব্যাবিলনের লোকেরা ঐ দেশকেই বলত আরালু আর মিশরীয়রা বলত আলু। আরবরা বিশ্বাস করত মহাপ্লাবনের পূর্বে অ্যাড নামে একটা দেশ ছিল যে দেশের নরনারী পাপাচারে এতদূর লিপ্ত হয়েছিল যে তাদের পাপের শাস্তিস্বরূপ প্লাবন দ্বারা সেই দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরাও আটলানটিসের অস্তিত্ব জানত। তারা বলত পুব মহাদেশ থেকে একদল অতিমানুষ এসে তাদের সভ্য করেছে। উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান এবং মেকসিকোর মানুষ এই মতে বিশ্বাসী। আটলানটিক এবং আটলানটিস নামেও একটা মিল আছে।

গ্রীক মহাবলী অ্যাটলাস পৃথিবীকে কাঁধে বহন করছে, সেই অ্যাটলাস থেকে আটলানটিক নামটা এসেছে। আটলানটিক থেকে আটলানটিস নাম হয়তো এসেছে। এই মত সঠিক কি না তা হয়তো আরও সঠিক ভাবে জানা যেত যদি প্রাচীন লিপি ও পুঁথি যদি হারিয়ে না যেত। তবে বর্তমানে আটলানটিস নিয়ে গবেষণা চলছে, আশা করা যায় কালক্রমে অনেক তথ্যই জানা যাবে।

মার্কিন কংগ্রেসম্যান ইগনেসিয়াস ডনেলি আটলানটিস সম্বন্ধে একটি তথ্যমূলক বই লেখেন। সেই বই প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। তিনি লিখেছেন পুরনো ও নতুন পৃথিবীর মধ্যে অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকার মাঝে আটলানটিস একটি সেতু।

আটলানটিস সম্বন্ধে মানুষকে প্রথম যিনি সচেতন করে দিলেন তাঁর নাম এডগার কেসি। ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে তিনি সর্বজনমান্য। ১৯২৩ সালে কেসি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বিমিনি দ্বীপে আটলানটিসের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে। তিনি তারিখও বলে দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় যে প্রায় ঠিক সময়ে এবং বিমিনি দ্বীপে ধ্বংসাবশেষ অবিষ্কৃত হয়েছিল। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

জলের নিচে কয়েকটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বিশেষ ক্যামেরার সাহায্যে দু'জন পাইলট সেগুলির ফটো তুলেছিল। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জেও বেশ কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এমন কি হাইটি থেকে অদূরে একটা পুরো শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে বলে বিশ্বাস। কাছেই একটা হ্রদের তলায়ও অনেক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ১৯৬৮ সালে বিমিনি দ্বীপের উত্তরে তিরিশ ফুট আন্দাজ জলের নিচে পাথরে

বাঁধানো একটা রাস্তা পাওয়া গেছে।

এইসব থেকে অনুমান করা হয় যে আটলানটিক সমুদ্রের যে অংশ কনটিনেনটাল শেলফ নামে পরিচিত সেই অংশ একটা শুকনো ডাঙা ছিল। কালক্রমে সেই ডাঙা ডুবে যায়। মানুষ তখন সভ্য হয়েছে।

আটলানটিস যেখানে ছিল সেখানে সমুদ্রের নিচে তল্লাসি চলছে। ইগনেসিয়াস ডনেলি তাঁর বইতে লিখেছেন, ধরে নেওয়া যাক ভূমধ্যসাগরের বিপরীতে অ্যাজোরস দ্বীপের কাছে সমুদ্রের নিচে অনুসন্ধান করতে করতে হাজার মাইল চওড়া আর দুই থেকে তিন হাজার মাইল লম্বা একটা বিরাট দ্বীপের সন্ধান পেয়ে যাই তাহলে প্লেটোর কথা মেনে নিতে হবে। প্লেটো লিখেছেন, হারকিউলিসের স্তম্ভের (জিব্রালটার ?) ওধারে বড় একটা দ্বীপ আছে যা এশিয়া (মাইনর) এবং লিবিয়া যোগ করলে যা হবে তার চেয়েও বড়।

অ্যাজোরস দ্বীপটা হয়ত আটলানটিসের একটা পর্বত চূড়া। জলের নিচে এখনও হয়তো সুপ্ত আগ্নেয়গিরি এবং লাভা স্রোত দেখা যাবে। তাহলে প্লেটোর উক্তি 'এক দিন ও এক রাত্রি ধরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় তারপরই মহাপ্লাবন এসে সেই দেশ ও শৌর্যশালী মানুষদের ডুবিয়ে দেয়'।

বর্তমানে সমুদ্রগর্ভে তল্লাসী চালিয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মার্কিন জাহাজ ডলফিন, জার্মান জাহাজ গেজেল, ব্রিটিশ জাহাজ পরকুপাইন এবং চ্যালেঞ্জার আটলানটিসের তলদেশের মানচিত্র তৈরি করেছে। জাহাজ থেকে শব্দতরঙ্গ পাঠিয়ে সমুদ্রতলের অনেক রহস্যের সন্ধানও পাওয়া গেছে।

আটলানটিক সমুদ্রের নিচে যে বিস্তৃত এলাকায় আটলানটিস ছিল বলে বিশ্বাস সমুদ্রের সেই বিস্তৃত অংশ সমুদ্রের অন্য অংশ অপেক্ষা বেশ উঁচু। আটলানটিক সমুদ্রের প্রায় সবটাই তখন আটলানটিস ছিল।

আটলানটিসের মাটি ধুয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক অংশ গঠিত হয়েছে। অ্যাজোরস, সেন্টপলস অ্যাসেনসন ও ট্রিস্টাম ডা'কুনহা যেটি পৃথিবীর নির্জনতম দ্বীপ বলে বিবেচিত, সেগুলি ছিল আটলানটিসের পর্বত চূড়া।

ইগনেসিয়াস ডনেলির সময় যা জানা ছিল বর্তমানে আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে তার থেকে অনেক বেশি জানা যাচ্ছে। 'সোনার' প্রেরিত শব্দ-তরঙ্গ রিসার্চ ল্যাবরেটরি সমন্বিত সাবমেরিন জলে ডুবে যাওয়া পাহাড়, এবং মালভূমি, খাত সমভূমি ইত্যাদির সন্ধান দিচ্ছে সেইভাবে মানচিত্র তৈরী করা যাচ্ছে।

আটলানটিক সমুদ্রের তলদেশ এখনও স্থিতিশীল বা মজবুত হয় নি। এখনও মাঝে মাঝে ভূমিকম্প ও জলে ডোবা আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে। এই তো ১৯৬৬ সালেই আইসল্যাণ্ডের কুড়ি মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বেশ বড়সড় একটা দ্বীপ জেগে উঠেছে জলের নিচে আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠার ফলে।

অবশ্য দু'শো বছর আগে আর এক অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আইসল্যাণ্ডের এক পঞ্চমাংশ মানুষ মারা গিয়েছিল। এখন অনেক আগ্নেয়গিরি মাঝে মাঝে জানিয়ে দেয় যে তারা মরে নি, রীতিমতো বেঁচে আছে।

অধিকাংশ ভূতাত্ত্বিক বিশ্বাস করেন যে আটলানটিকের বুকে একদা একটা বিশাল দ্বীপ ছিল তবে তা পৃথিবীতে মানুষ আসবার পরে জলে ডুবেছে কি না সে বিষয়ে কারও সন্দেহ আছে।

কলমবাস অনেক পুরনো ম্যাপ সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সব ম্যাপে অ্যানট্রিলিয়া, অ্যানটিলহা এবং অ্যানটিগলিয়া প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। একটি ম্যাপে দেখা যায় অ্যানটিলিয়া নামে দেশটি পর্তুগালের কাছাকাছি অবস্থিত।

একদল ভূতাত্ত্বিক বলছেন আটলানটিস দ্বীপটি আটলানটিক সমুদ্রে অবস্থিত ছিল না আসলে ওটি ছিল উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার একাংশ। একদা সে দেশ গাছপালা ও জীবজন্তুতে পূর্ণ ছিল, জমি ছিল উর্বরা, মানুষ ছিল সুখী। অ্যালজিরিয়ার তাসিলি পাহাড়ের গুহায় অনেক পুরনো ছবি দেখলে এই উক্তির সমর্থন মিলবে। গুহার ছবিগুলি অন্ততঃ দশ হাজার বছর পুরনো। পরে সে দেশের আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়, দেশের চেহারা পালটে যায়।

ফরাসি অনুসন্ধানকারীরা দাবি করেন যে ফরাসি অধিকৃত আফ্রিকায় একদা আটলানটিস দেশটি ছিল। এই এলাকায় এখনও নদী ও হ্রদের চিহ্ন পাওয়া যায়, প্রাচীন সভ্যতারও নিদর্শন দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন সুদূর অতীতে ফ্রান্সই ছিল আটলানটিস।

স্পেনের পুরাতত্ত্ববিদরা দাবি করেন যে স্পেন এবং স্পেন অধিকৃত আফ্রিকা জুড়ে ছিল আটলানটিস। অনুরূপভাবে পর্তুগিজরাও দাবি করেন পর্তু-গালের এক অংশ ছিল আটলানটিসের মধ্যে, বাকি অংশ ডুবে গেছে।

রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন স্থানে আটলানটিসের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁরা বলেন এখন যেখানে ক্যাসপিয়ান সি, সেখানেই ছিল আটলানটিস তবে বর্তমানে একদল রাশিয়ান বিজ্ঞানী নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন যে অ্যাজোরস দ্বীপ ঘিরে ছিল আটলানটিস।

জার্মান বিজ্ঞানীরা বলেন আটলানটিস ছিল নর্থ সি-এর নিচে। আইরিশ ও ইংরেজ বিজ্ঞানীরা বলেন প্লেটোর দ্বীপ ছিল আয়ারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড। ভেনিজুয়েলার একজন পণ্ডিত বলেছেন, ভেনিজুয়েলা একদা সেই দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু সুইডেনের এক বিজ্ঞানী বলেন আটলানটিস যদি থেকে থাকে তবে তা ছিল সুইডেনের আপসালা এলাকায়।

ব্র্যামওয়েল নামে একজন লেখক তাঁর লস্ট আটলানটিস নামে বইতে লিখেছেন যে আটলানটিস নামে যদি কোনো দেশ থেকে থাকে তো তা আটলানটিক সমুদ্রেই ছিল নয়তো ঐ নামে কোনো দেশ ছিল না। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল বলেন প্লেটো যেভাবে তাঁর আটলানটিস কাহিনী হঠাৎ শেষ করেছেন তা পড়ে মনে হয় ব্যাপারটা প্লেটোর কল্পনা, ঐ নামে কোনো দেশ ছিলই না। অ্যারিস্টটল লিখেছেন, যিনি এর (আটলানটিসের) স্রষ্টা তিনিই এর ধ্বংসক।

আটলানটিস নিয়ে তর্কের শেষ নেই। কেউ বলেন ছিল, কেউ বলেন ছিল না। তবে ছিলর দলই ভারি। যদিও সাচ্চা প্রমাণ পাওয়া যায় নি তবুও অনেক প্রমাণ তো পাওয়া যাচ্ছে।

ডনেলি লিখেছেন : হাজার বছর ধরে মানুষ পম্পেই ও হারকিউলিয়ম

নগরীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে নি। হেরোডোটাস যে নীলনদ ও চ্যালডিয় সভ্যতার উল্লেখ করেছিলেন তাও মানুষ দীর্ঘদিন বিশ্বাস করে নি। কিন্তু প্রমাণ পাওয়ার পর বিশ্বাস করছে।

গ্রীসে ট্রয় নামে যে এক নগরী ছিল তাও মানুষ বিশ্বাস করে নি। মানুষ ভাবত হোমার বুঝি এক কাল্পনিক মহাকাব্য লিখেছেন কিন্তু হাইনরিখ শ্লিম্যান মাটি খুঁড়ে হারানো নগর ট্রয় বার করে প্রমাণ করলেন যে ট্রয় ছিল, হেকটর, অ্যাকিলিস, ইউলিসিস, হেলেন, এরা সবাই ছিল।

আটলানটিস সম্বন্ধে নানাভাবে নানা দিক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এমন কি পুনর্জন্মবাদেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

এডওয়ার্ড কেসির নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কেসি একজন ভবিষ্যৎ বক্তা। ১৯৪৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর এডগার কেসি ফাউণ্ডেশন একটি অ্যাসোসিয়েশন ফর রিসার্চ অ্যাণ্ড এনলাইটেনমেণ্ট স্থাপন করেছে। এই অ্যাসোসিয়েশন কেসির ভবিষ্যৎ বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে আটলানটিস সম্বন্ধে গবেষণা করছে। দীর্ঘদিন ধরে কেসি নানা ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যার মধ্যে আটলানটিস অনেকটা বড় অংশ জুড়ে ছিল। এইসব ভবিষ্যৎ বাণী সংকলন করা হয়েছে।

কেসিই প্রথম বলেছিলেন আটলানটিসের নিদর্শন প্রথমে কোথায় পাওয়া যাবে। তিনি আরও একটা ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন। তিনি বলে গেছেন মাটির নিচে একটা আটলানটিয়ান চেম্বার আছে, তার মধ্যে সেই হারানো মহাদেশের অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। মিশরে যে বিরাট স্ফিংকসের নরসিংহ মূর্তি আছে, সকাল বেলায় সেই নরসিংহ মূর্তির পায়ের থাবার ছায়া অনু-সরণ করলে বিশেষ একস্থানে নাকি সেই আটলানটিয়ান চেম্বার পাওয়া যাবে।

এডগার কেসি তাঁর দিব্যনেত্রে দেখেছেন আটলানটিস এক সুন্দর দেশ ছিল। সমস্ত বাড়ি ছিল পাথরের তৈরি। শহরগুলিতে স্বাচ্ছন্দ্যের নানা ব্যবস্থা, বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণের চমৎকার ব্যবস্থা ছিল, পরিবহন ব্যবস্থার নানারকম যানবাহন ছিল, বিমান এবং ডুবোজাহাজও ছিল। তারা সৌর-

শক্তি আয়ত্ত করেছিল। সেই সৌরশক্তি স্ফটিকের মধ্যে আবদ্ধ রেখে দরকার মতো ব্যবহার করত। আশ্চর্যের বিষয় যে মহাকর্ষ শক্তিকে তারা পরাভূত করতে পারত।

এমন উন্নত দেশের পতন হলো কেন ? প্রশ্ন করলে কেসি উত্তরে বলেছিলেন, জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ, ক্রীতদাস প্রথা, যথেচ্ছ যৌনাচার যথা সমকামিতা, অবাধ কামলীলা, নরবলি এবং শক্তির উৎস স্ফটিকের অপব্যবহার আটলানটিসের ধ্বংসের কারণ।

ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে বেশ কয়েকটি নিমজ্জিত শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। সমুদ্রের জলরেখা বৃদ্ধি পাওয়াই কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। ভেনিস শহর ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে হয়ত আগামী শতাব্দীতেই তা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হবে।

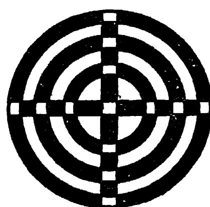
ভেনাস ডি মিলো, সেই অসাধারণ নারীমূর্তির তুই হাত একজন পুরাতত্ত্ববিদ খুঁজতে খুঁজতে সমুদ্রের চারশ ফুট নিচে একটা শহরের সন্ধান পেয়েছিলেন। তামিলনাড়ু উপকূলে মহাবলীপুরমে যেখানে আজ সাতটির বদলে মাত্র একটি মন্দির দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সমুদ্রের গভীরে একটি শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পৃথিবীতে এখনও ভাঙা গড়া চলছে অতএব একটা দেশ যে ডুবে যাবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই তবে আটলানটিস নামে দেশটা কেমন ছিল, কতটা উন্নত ছিল, সে বিচার পণ্ডিতেরা করবেন।

আটলানটিস সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে কয়েকটা ক্লাব ও সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে। তারা এই অবলুপ্ত দেশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে, বই কেনে, প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে, আলাপ আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হয়।

ফ্রান্সে এই রকম একটি সোসাইটি আছে। সরবোঁতে তাদের অফিস। একদিন কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে তুমুল তর্ক বাধল এবং সেই তর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে প্রথমে হাতাহাতি ও পরে কাঁদানে গ্যাস ও ছোড়াছুঁড়ি আরম্ভ হয়ে গেল।

আমেরিকার অনেক পণ্ডিত আটলানটিসের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এউইং তো পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তিনি দীর্ঘকাল আটলানটিক সমুদ্রে কয়েকটি জায়গা পরীক্ষা করে কিছুই দেখতে পান নি। পরে তিনি মন্তব্য করলেন যে, হ্যাঁ তিনি কিছু বড় বড় ভাঙা পাথর দেখেছেন, সেগুলি কিছুই নয় অতএব আটলানটিসের অস্তিত্ব নেই। তিনি কিছু দেখতে পান নি অতএব তা নেই বা থাকতে পারে না।
একটা বড় পাথরের বাড়ি যদি জলের তলায় কয়েক হাজার বছর ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকে তাহলে তো তার ওপর কাদা, মাটি, পাঁক জমবে, জলজ উদ্ভিদও হয়তো ঘিরে ধরবে অতএব ওপর থেকে দেখে কি কিছু সাব্যস্ত করা যায়? ডঃ এউইং তো তাই করলেন।
আর একজন বিজ্ঞানী তিনি আটলানটিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে বিশ্বাসী, আটলানটিস নিয়ে দীর্ঘদিন পড়েও আছেন কিন্তু দেশটা যে কোথায় ছিল তা তিনি কিছুতেই ঠিক করতে পারছেন না। আরও বলছেন, দেশ একটা ছিল নিশ্চয় আর আটলানটিস নামটা তো আমরা দিয়েছি, আসল নাম কি ছিল দেশটার? তাঁর বিশ্বাস দেশের নাম যেদিন জানা যাবে সেদিন জানা যাবে সে দেশ কোথায় ছিল। তিনি বিশ্বাস করেন যে আমাদের ধারণা অপেক্ষা মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আরও প্রাচীন। কিন্তু আটলানটিক নামের সঙ্গেই যে আটলানটিসকে যুক্ত থাকতে হবে তার কোনো যুক্তি তিনি খুঁজে পান না।



এডগার কেসির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'সিয়ার'

কেসি ছিলেন সেইরকম একজন ব্যক্তি। আমেরিকায় তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তিনি যেসব ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন তার অধিকাংশই মিলে গেছে।

ড: ডেভিড ডি জিংক টেকসাসে বোমণ্ট শহরে লামার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির প্রফেসর কিন্তু তিনি নানা বিষয়ে চর্চা করেন যথা প্যারাসাইকোলজি, মানুষের মন ও অভিব্যক্তি এবং আটলানটিস। এবং তাঁর নিজস্ব একটা মতবাদ আছে যেটাকে তিনি বলেন 'সাইকোইন্টিগ্রেশন'।

ডঃ জিংক আটলানটিস অনুসন্ধান ও এডগার কেসি নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। আমরা সেই প্রবন্ধটির কিছু কিছু অংশ এখানে পেশ করছি।

জিংক প্রথমেই লিখছেন আটলানটিস এবং বারমুডা ট্র্যাঙ্গেল এবং অন্যান্য বিষয়ে কেসি তাঁর দিব্যনেত্রে যা দেখেছেন তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শব্দসংখ্যা মোট এক কোটি। এগুলি সযত্নে ভারজিনিয়া স্টেটের ভারজিনিয়াতে অ্যাসোসিয়েশন ফর রিসার্চ অ্যাণ্ড এনলাইটেনমেণ্ট-এ সযত্নে রক্ষিত আছে। মস্তবড় নাম কিন্তু শব্দসমষ্টি থেকে তিনটি বর্ণ বেছে নিয়ে ছোট নাম দেওয়া হয়েছে এ আর ই অর্থাৎ 'আর'।

আমেরিকানরা কেসিকে কখনও অবহেলা করে নি, তাঁর কোনো ভবিষ্যৎ বাণী অবিশ্বাস করে নি, তাঁকে আমেরিকানরা প্রফেটের আসনে বসিয়েছিল। বিজ্ঞানীরাও তাঁর কথা বিশ্বাস করত এবং মানুষ যে নিজের বস্তুবাদী জগতকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এ বিষয়ে আমেরিকানদেরও বিশ্বাস জন্মাচ্ছে।

কেসিকে আটলানটিস বা কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কেসি চোখ বুজতেন এবং অন্য এক জগতে চলে যেতেন। তখন বাস্তব পরিবেশ সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞান। এই সময়ে তিনি নাকি মৃত ব্যক্তিদের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন এবং কিছুক্ষণ পরে প্রশ্নের উত্তর বলতে আরম্ভ করতেন।

ভারতীয়দের কাছে এ ব্যাপার নতুন নয়। অনেক খাঁটি সাধুপুরুষ আছে যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে অনেক ভালো কথা এমন কি ভবিষ্যৎ বাণীও প্রচার করেছেন। এডগার কেসিকে আটলানটিস সম্বন্ধে দীর্ঘদিন ধরে বহুবার প্রশ্ন

করা হয়েছিল। এজন্যে তিনি ১৯২৩ সালের ১১ অকটোবর থেকে ১৯৪৫ সালের ৩ জানুয়ারির মধ্যে মোট দু হাজার পঁচিশ বার সমাধিস্থ হয়ে প্রশ্ন-গুলির উত্তর দিয়েছিলেন।

প্রশ্নোত্তরের সময় কেসি আটলানটিসের উত্থান, তার স্বর্ণযুগ এবং তার ধ্বংস কি করে হলো তাও বলেন। পাথরের তৈরি বড় বড় শহর, বর্তমান কালের মতো পরিবহন ব্যবস্থা মায় জল, স্থল ও আকাশের যান এবং জল-তলের যান, মহাকর্ষ বাতিল, সৌরশক্তি আহরণ করে পাথরে আহরণ এবং সেই শক্তি দ্বারা বিভিন্ন যান চলাচলের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় তিনি যা বলেছেন তা বর্তমানে কেউ বিশ্বাস করবে কি না বলা যায় না, কিন্তু কেসির প্রতি যাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে তারা বিশ্বাস করে।

আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক কাহিনী অনেকেই বিশ্বাস করেন না কিন্তু বর্তমানে গবেষকরা সেগুলির বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা করেছেন।

অশোক স্তম্ভ বলে আমরা যেটি চিনি সেটি লোহার তৈরি কিন্তু কি আশ্চর্য এই লোহার গায়ে কোথাও একটুও মরচে পড়েনি অথচ আজকাল উন্নত বিজ্ঞানের যুগে তৈরি অনেক স্টেনলেস স্টিলের বাসনে মরচে ধরে।

মহেঞ্জোদড়োর মানুষেরা কি করে গম সংরক্ষণ করেছিল কে জানে? পাঁচ হাজার বছর পরেও তা তাজা ছিল। মাটিতে পোঁতবার পর সেই গম থেকে চারা বেরিয়েছিল। মাত্র এই দুটি উদাহরণ চোখের সামনে দেখে আমরা যদি বিশ্বাস করে থাকি তাহলে আটলানটিসের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নয় তবে প্রশ্ন দেশটির অবস্থান কোথায় ছিল?

সৌরশক্তি দ্বারা উজ্জীবিত 'ফায়ার স্টোন' বা স্ফটিক জলের তলায় থাকলেও আজও নাকি সক্রিয় এবং সেই স্ফটিক নাকি বারমুডা ট্র্যাঙ্গেল এলাকায় বিপর্যয় ঘটাচ্ছে।

কেসির মতে ঐ স্ফটিকের অপব্যবহার আটলানটিসের ধ্বংসের কারণ।

কেসি আরও একটি উক্তি করে সকলকে চমকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে যীশুর প্রথম অবতার অ্যামেলিয়াস এই আটলানটিসেই আর্বিভূত হয়েছিলেন। সভ্যতার চূড়ান্তে পৌঁছেও আটলানটিসবাসীরা নিজেদের

সংযত রাখতে পারে নি। তারা বড় বেশি বস্তুবাদী হয়ে পড়েছিল যার মধ্যে অন্যতম হলো ক্রীতদাস প্রথা, শোষণ, মানুষকে অবিশ্বাস ও যথেচ্ছ কামাচার ও যৌনলীলা। কেসির মতে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিল যখন "সনস অফ দি ল অফ ওয়ান" এবং "সনস বিলিয়াল" পরস্পরের সঙ্গে চরম সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। (ডেডসী স্ক্রল-এ সনস অফ লাইট এবং সনস অফ ডার্কনেস-এর উল্লেখ আছে)।

কেসি বলেন বেলিয়ালের পুত্রগণের এতদূর অবনতি হয়েছিল যে তারা নরবলি দিতে আরম্ভ করে, কামাচারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পাত্রপাত্রী ছিল না, তারা অবাধ যৌনলীলাকে প্রশ্রয় দিত। তারপর প্রকৃতিদত্ত শক্তি নিয়ে তারা ছেলেখেলা করেছে। ঐ শক্তিদায়ী স্ফটিক যা রোগ আরোগ্য করত তাকে নিকৃষ্ট কাজে প্রয়োগ করা হতে থাকে। এই শক্তি প্রয়োগে মানুষের ওপর অত্যাচারও করা হতো যা পূর্বে নিষিদ্ধ ছিল।

কেসি বলেন আটলানটিসের অনেক মানুষ দ্বাদশ শতকে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল, কেউ সমাজসেবা করত, কেউ মানুষকে শোষণ করত। কেসি লক্ষ্য করেছেন পুনর্জন্মপ্রাপ্ত এই সব ব্যক্তিরা একক বা যৌথভাবে কাজ করত।

আটলানটিস সম্বন্ধে কেসির সমস্ত উক্তিগুলি সংগ্রহ করে তাঁর এক পুত্র এডগার ইভানস কেসি একটি পুস্তক রচনা করেছেন। পুস্তকটির নাম এডগার কেসি অন আটলানটিস, ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৩৩ সালের ১ ফেবরুয়ারি তারিখে কেসি একটা উক্তি করেছিলেন যে আটলানটিসের মানুষরা 'ডেথ রে' প্রয়োগ করত, মানুষ সেই অস্ত্র পঁচিশ বছর পরে আবার আবিষ্কার করবে। তাঁর সেই ভবিষ্যৎ বাণী প্রায় ঠিক হয়েছে। ১৯৫৭ সালে ল্যাবরেটরিতে অ্যান্টিনিউট্রন আবিষ্কৃত হয় যা থেকে অ্যান্টিম্যাটার তৈরির সম্ভাবনা দেখা দেয় যার কাছে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ম্লান হবে। বস্তুতঃ ১৯৫৮ সালে আমেরিকার বেল ল্যাবরেটরিতে, যেখানে ট্রানজিস্টর উদ্ভাবিত হয়েছিল, প্রথমে 'মেসার' রশ্মি ও পরে 'লেসার' রশ্মি আবিষ্কৃত হয়েছে। এক প্রকার লেসার রশ্মিতে রুবি ব্যবহার করা হয়। আটলানটিসের মানুষরা শক্তি-রশ্মি উৎপাদনে স্ফটিক

ব্যবহার করত। মেসার ও লেসার রশ্মির ধ্বংসকারী শক্তি প্রচণ্ড নয়।
আটলানটিস সম্বন্ধে কেসির উক্তিগুলি ভিত্তি করে কেউ কেউ অনুমান করেন যে বিমিনি দ্বীপের কাছে আটলানটিসের যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে বলে বিশ্বাস সেখানে হয়ত এখনও সেই শক্তি আহরণকারী ও বিকিরণকারী স্ফটিক এখনও আছে এবং সেই স্ফটিক থেকে বিকিরিত রশ্মি বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকায় বিমান বা জাহাজ নিরুদ্দিষ্ট করছে। বিমিনি দ্বীপ বারমুডা ট্র্যাঙ্গেল এলাকার মধ্যেই অবস্থিত।

আটলানটিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আগে কিছু বললেও তার ধ্বংসাবশেষ প্রথমে কোথায় পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কেসি সঠিকভাবে ১৯৩৩ সালে বলেন যে ফ্লোরিডা উপকূল থেকে অদূরে বিমিনি দ্বীপে আটলানটিসের একটি মন্দিরের কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে। তা যে পাওয়া গিয়েছিল এ কথা আগেই বলা হয়েছে। তারপর ১৯৪০ সালে আবার বলেন যে আটাশ বছরের মধ্যে এই ধর ১৯৬৮ বা ১৯৬৯ সালে আটলানটিসের পজিডিয়ার অংশ বিশেষ জেগে উঠবে।

বিমিনি এলাকায় প্রথম আবিষ্কার হয় ১৯৫৬ সালে। আগেও হয়ত হতে পারত কিন্তু কারা অনুসন্ধান করবে, কে জলের নিচে নামবে, কারা টাকা যোগাবে এসব স্থির করতেও তো সময় লাগে!

কাজ চলতে থাকে। ১৯৫৮ সালে নর্থ ক্যারোলিনার ডঃ উইলিয়ম বেল বিমিনির পশ্চিমে ছ ফুট লম্বা একটা থাম আবিষ্কার করেন। রবার্ট ফেরো এবং মাইকেল গ্রামুলি তাঁদের বই আটলানটিস: দি অটোবায়োগ্রাফি অফ এ সার্চ-এ লিখেছেন যে থামটি খাড়া দাঁড়িয়েছিল এবং ফটো তোলার পর লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে থামের গোড়া থেকে মৃদু আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

১৯৬৮ সালে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এক বছর আগে আবিষ্কারক ও জলের নিচে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন এমন একজন বিজ্ঞানী যাঁর নাম ডিমিট্রি রেবিকফ তিনি অ্যানড্রস দ্বীপের উত্তরে বিমান থেকে একটা বিরাট পাথরের ব্লক খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন, অবশ্য জলের

নিচে। পাথরটা লম্বায় বেশি চওড়ায় কম যাকে বলে রেক্টাঙ্গুলার। ঠিক তার পরের বছর ঐ অ্যানড্রস দ্বীপের উত্তরে জলের নিচে মস্ত বড় একটা কাঠামো দেখা যায় যার এক দিকের মাপ ষাট ফুট, অপর দিকে একশ ফুট। সবটাই পাথরের তৈরি।

এই কি সেই পজিডিয়ার ধ্বংসাবশেষ যা ১৯৬৮/১৯৬৯ সালে জেগে উঠবে বলে কেসি আগেই বলেছিলেন? এটি লক্ষ্য করেছিলেন বিমান থেকে তু'জন পাইলট যারা অ্যাসোসিয়েশন ফর রিসার্চ অ্যাণ্ড এনলাইটেনমেণ্ট অর্থাৎ 'আর'-এর পক্ষ থেকে কেসির ভবিষ্যৎ বাণী যাচাই করবার জন্যে বিমান নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। পাইলট তু'জনের নাম রবার্ট ব্রাশ এবং ট্রিগ অ্যাডামস। পাইলট তু'জন তাঁদের আবিষ্কারের কথা মিয়ামির বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ও প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ জে ম্যানসন ভ্যালেনটাইনকে এবং রেবি-কফকে জানান।

এরা তু'জন রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং কাজে নেমে পড়েন। মাত্র ছ'ফুট জলের নিচে তাঁরা কতকগুলি দেওয়াল দেখেন, তিনফুট পুরু। দেওয়ালে লাইমস্টোনের আধিক্যও তাঁরা লক্ষ্য করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন এটি একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। দেওয়ালগুলির মাথা জলের তু'ফুট ওপরে জেগেছিল।

বিজ্ঞানী তু'জন মন্দিরের ফ্লোর প্ল্যানের মাপ নিয়ে লক্ষ্য করেন যে এই মাপ মধ্য অ্যামেরিকায় ইউকেটানে যে টেম্পল অফ টার্টল আছে তার সঙ্গে এক।

ভ্যালেনটাইন ও রেবিকফ ঐ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের এক মাইলের মধ্যে আরও তু'টি ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করলেন এবং তারপর থেকে অ্যানড্রস এলাকায় মোট বারোটা ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন।

ডঃ ভ্যালেনটাইন চুপ করে বসে রইলেন না। তিনি এবার বিমিনি এলাকায় জলের তলায় খোঁজ করতে লাগলেন। প্রথমে পেলেন তু'টি ভাঙা প্রাচীর। এই প্রাচীর তু'টির জন্যে বেশি হাতড়াতে হয়নি। কেন না, জলের ওপরে প্রাচীরের মাথাগুলি দেখা যাচ্ছিল। দেখা গেল ঐ প্রাচীর উপকূল বরাবর

প্রায় আঠারশ ফুট পর্যন্ত চলে গেছে। নর্থ বিমিনি দ্বীপের প্যারাডাইস পয়েন্টের কাছেই এই প্রাচীর দেখা যাবে।

ভ্যালেনটাইন এবং রেবিকফ এবং অন্য সহযোগীদের সঙ্গে ভ্যালেনটাইন যেসব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করলেন সে বিষয়ে কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। ডঃ ভ্যালেনটাইন নিজেও প্রবন্ধ লিখলেন।

ডঃ ভ্যালেনটাইন লিখেছেন তিনি একটা পাথরে বাঁধানো পথ পেয়েছেন। পাথরগুলি অবশ্য এখন যথাস্থানে বসানো নেই, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। পাথরগুলি রেকট্যাঙ্গল বা পাঁচকোনা। সেগুলি মাপ করে কাটা খাপে খাপে বসানো যায়। পাথরগুলি বেশ পুরু, বেশির ভাগ পাথরের আকার ঠিক নেই, বেশির ভাগ পাথরের ধার ক্ষয়ে গেছে, কয়েকটাকে তো পাঁউরুটির মতো বা বালিশের মতো দেখাচ্ছে। অনেকগুলির আকার ঠিক আছে।

রেবিকফ তার ডুবোজাহাজ 'পেগেসাস' থেকে ভাগ্যিস পাথরগুলির ছবি আগেই তুলে নিয়েছিল, কারণ কয়েক মাসের মধ্যেই পাথরের সেই পথ বালি চাপা পড়ে যায়।

১৯৬৯ সালের ফেবরুয়ারি মাসে ডঃ ভ্যালেনটাইন ও রেবিকফ আবার জলে নেমে পড়লেন। এবারের অভিযান বেশ বড়। কেসি সমর্থক মেরিন আরকিওলজিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি সংক্ষেপে 'মার্স' এবং কয়েকজন নামী পুরাতাত্ত্বিক ও একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফারও যোগ দিয়েছিলেন। জলের তলায় ফটো তোলার জন্যে ঐ ফটোগ্রাফার বিখ্যাত। এই অভিযানটির বিবরণী রবার্ট ফেরো এবং মাইকেল গ্রামলি তাঁদের আটলানটিস-দি অটোবায়োগ্রাফি অফ এ সার্চ বইতে লিখে রেখেছেন।

জলের বেশি নিচে ওঁদের নামতে হয় নি, পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ ফুটের মধ্যেই ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছিল। বিমিনি রোডের কাছেই একটা দেওয়াল পাওয়া গেল। দেওয়ালে আঘাত করার পর অন্য রকম আওয়াজ পাওয়া গেল, ধাতব, কোনো ধাতুতে আঘাত করলে যে রকম শব্দ হতে পারে সেই রকম শব্দ।

এই অভিযানে ১২ জুলাই থেকে ২৯ নভেম্বরের মধ্যে ঐ ফটোগ্রাফার পিনো টুরোলা বিমিনি রোডের পশ্চিমে চুয়াল্লিশটা থামের ফটো তুলেছিল। থামগুলির অধিকাংশ ভেঙে পড়ে গেছে, কয়েকটি দাঁড়িয়েও আছে। যেগুলির ফটো তোলা হয়েছিল সেগুলি তিন থেকে পাঁচ ফুট উচ্চ আর তাদের ব্যাস দুই থেকে তিন ফুট।

পিনো টুরোলা ২৯ নভেম্বরের পরে বিমিনি দ্বীপের পশ্চিমে জলে ১৫ ফুট নিচে আরও কতকগুলি থামের ছবি তুলেছিল। এই থামগুলি আরও মোটা ও লম্বা, প্রায় সবগুলির ব্যাস তিন থেকে ছয় ফুট আর উচ্চতায় পনেরো ফুট পর্যন্ত আর সেগুলি বেশ বৃত্তাকারে সাজানো আছে। মনে হয় বিরাট গোলাকার একটি হল ছিল, ছাদ কবে ভেঙে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কয়েকটা ভাঙা থাম আজও দাঁড়িয়ে আছে।

আরগসি মাসিক পত্রিকার নভেম্বর ১৯৭১ সংখ্যায় রবার্ট মার্কস এই থামগুলির বিবরণী লিখেছে। যেখানে এই থামগুলি পাওয়া গিয়েছে তার মাইলখানেক দক্ষিণে টুরোলা অনুরূপ অনেকগুলি থামের ছবি তুলেছিল।

বিমিনি থেকে কিছু দূরে আছে প্যারাডাইস পয়েন্ট। এখানে কিছু ধ্বংসাবশেষ আছে। বেশ বড় একটা দল এখানে জলের নিচে নেমে পড়ে। এই দল ছিল মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন জিওলজি ডিভিসনের জন গিফোর্ডের। গিফোর্ড ছিল দলের প্রধান নেতা। দলে আরও যারা ছিল তারা হলো মিয়ামি ডেড জুনিয়র কলেজের মেরিন সায়েন্স টেকনোলজির অধ্যাপক রিচার্ড বেনসন এবং মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিসারিজ ডিভিশনের নিকোলাস চিটি, মেরিন বায়োলজি বিভাগের প্যাট্রিক কোলিন এবং আরকিওলজি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ জন ই হল। এই দল ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের শেষে জলের নিচে আঠার ঘণ্টা ধরে অনুসন্ধান কাজ চালান।

জন গিফোর্ড আবার ফিরে আসে ১৯৭১ সালের অকটোবর মাসে। এবার তার সঙ্গে ছিল ওয়াশিংটন (ডি সি)-এর সায়েন্টিফিক এক্সপ্লোরেশন অ্যাণ্ড আরকিওলজিক্যাল সোসাইটির, প্রতিটি শব্দের, প্রথম অক্ষর নিয়ে যার নাম

'সিজ' তারই প্রেসিডেন্ট ট্যালবট শ লিণ্ডস্ট্রম। ওদের এবার পাঠিয়েছিল যুক্তভাবে মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকার বিখ্যাত ন্যাশানাল জিও-গ্রাফিক সোসাইটি।

গিফোর্ড ও লিণ্ডস্ট্রম ১৯৭২ সালের এপ্রিলে ঐখানে আবার ফিরে আসে। ব্যাপারটা তারা কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না। ১৯৭৩ সালে জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আটলানটিস সম্বন্ধে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে-ছিল। গত অভিযানগুলিতে কি পাওয়া গেছে সে বিষয়ে এই আলোচনা সভায় লিণ্ডস্ট্রম 'কালচারাল হেরিটেজ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে-ছিল।

এই সব অভিযানগুলির ফলে কয়েকটি প্রশ্ন উঠেছিল। প্যারাডাইস পয়েন্ট, নর্থ বিমিনি আইল্যাণ্ড বা বাহামা আইল্যাণ্ডের কাছে যা পাওয়া গেছে সেগুলি কি মানুষের হাতের কাজ না কি প্রাকৃতিক কোনো ব্যাপার? ধ্বংসাবশেষ বলে যা মনে করা হচ্ছে তা ভূতাত্ত্বিক না পুরাতাত্ত্বিক? জিও-লজিক্যাল না আরকিওলজিক্যাল?

ডঃ জন ই হল এই সকল অভিযানের ফলাফল একটি প্রবন্ধে লিখেছেন। প্রবন্ধটির নাম বেশ বড়, বিনিথ দি সি অফ দি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ; ক্যারি-বিয়ান, বাহামাজ, ফ্লোরিডা, বারমুডা। ডঃ হল সোজাসুজি বলেন, ন্যাশ-নাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির উদ্যোগে আমরা এই অভিযান চালিয়ে-ছিলুম। জলের নিচে যে সকল ধ্বংসাবশেষ দেখেছি সেগুলি প্রাকৃতিক ব্যাপার, জলের নিচে পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে এমন আকার নিতে পারে, আমা-দের বিজ্ঞানীদের ভাষায় ওগুলিকে "প্লাইস্টোসিন বিচ রক ইরোসন অ্যাণ্ড ক্র্যাকি" বলা হয়। আমরা এমন কোনো প্রমাণ পাই নি যার দ্বারা বলা যায় ওগুলি মানুষের তৈরি অথবা কোনো ধরনের এঞ্জিনিয়ারিং। দুঃখের বিষয় রূপকথায় যারা বিশ্বাস করে তাদের নিরাশ করতে হলো। আর এক আটলানটিসকে বাতিল করতে হলো।

২৫ ফেবরুয়ারি ১৯৭১ তারিখের জন গিফোর্ডের রিপোর্ট অনুসারে জানা যায় যে জলের নিচে তিনি যা দেখেছেন তা মানুষের তৈরি হতেও পারে,

তিনি নিশ্চিত নন, কিছু সন্দেহ আছে।

পরে গিফোর্ড অন্য মত প্রকাশ করেন। ইন্টারন্যাশানাল জার্নাল অফ নটি-ক্যাল আরকিওলজি অ্যাণ্ড আণ্ডারওয়াটার এক্সপ্লোরেশন পত্রিকায় স্পষ্ট-ভাবেই লেখেন যে বিমিনির কাছে তিনি যা দেখেছেন তা প্রাকৃতিক ব্যাপার, 'এ ন্যাচারাল বিচ রক ডিপজিট'।

এই প্রবন্ধটির লেখক ডেভিড ডি জিংক লিখছেন, ল্যামার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিনা বেতনে ছুটি নিয়ে আটলানটিস ব্যাপারটা পুরাতাত্ত্বিক না ভূ-তাত্ত্বিক সেটা যাচাই করবার জন্যে ১৯৭৪ সালের পয়লা জানুয়ারি ছোট একটা ন'টন পালতোলা জাহাজে চেপে গ্যালভেসটন থেকে ফ্লোরিডার দিকে যাত্রা করলুম। জাহাজের নাম 'মাকাই-টু'। ফ্লোরিডা হয়ে বাহামাও যাব। এই অভিযান বাবদ সমস্ত খরচ একজন ধনী ব্যক্তি যুগিয়েছিলেন।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আটলানটিস নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছে তা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা, কাদের কথা ঠিক, আরকিওলজিস্টদের না জিও-লজিস্টদের। এই অভিযানে বিমান থেকে এমন জলের নিচেও ফটো তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই অভিযানটা খানিকটা ছিল শিক্ষামূলক, অবশ্য মূল উদ্দেশ্য ছিল আটলানটিস অভিযান।

জন গিফোর্ডের এবং ডঃ ম্যানসন ভ্যালেনটাইনের রিপোর্ট আমরা সংগ্রহ করেছিলুম। বিমিনি রোড অঞ্চলে ভ্যালেনটাইন কোথায় কি দেখেছিলেন তা তিনি মানচিত্রের সাহায্যে আমাদের বুঝিয়ে দেন।

ডঃ ভ্যালেনটাইন খুবই উৎসাহী। চার্লস বেরলিটজ যিনি বারমুডা ট্র্যাঙ্গল, উইদাউট এ ট্রেস ইত্যাদি বই লিখে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর দু'খানি বই লেখার সঙ্গে ভ্যালেনটাইন সহযোগিতা করেছিলেন। একটি বই অবশ্য বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এবং অপর বইটি হলো মিস্ট্রিজ ফ্রম ফরগটেন ওয়ার্ল্ডস।

ডঃ ভ্যালেনটাইন একাধারে প্রাণিতত্ত্ববিদ এবং ভূতাত্ত্বিক, পণ্ডিত ব্যক্তি। প্রশান্ত মহাসাগরে এবং মেকসিকোতে তিনি অনেক আবিষ্কার করেছেন। পনেরো বছরের বেশি সময় ধরে ভ্যালেনটাইন গ্র্যাণ্ড বাহামা ব্যাংকস-এর

কাছে আটলানটিসের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে পড়ে আছেন। আকাশ থেকেও যেমন পর্যবেক্ষণ করেন তেমনি নিজে জলে ডুব দিয়েও অনুসন্ধান চালান। এই অঞ্চলে তিনি তিরিশটি পৃথক ধ্বংস দেখেছেন। আমরা যখন মিয়ামি পৌঁছলুম তখন তিনি নিজে এসে মানচিত্র দেখিয়ে আমাদের স্থানগুলি বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর নাটকীয় আবিষ্কার হলো চার পাঁচ একর জুড়ে একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ। বাহামা ব্যাংকস-এর দক্ষিণে এই ভাঙা শহরের অবস্থান।

বিমান থেকে ভ্যালেনটাইন এই ভাঙা শহরের যে ফটো তুলেছিলেন তার সঙ্গে পেরুর প্রাচীন মাটির তৈরি শহরের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, বিশেষ করে যে সব শহরগুলি সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। ভ্যালেনটাইন হয়তো বলতে চেয়েছেন যে আটলানটিসের যে সকল অধিবাসীরা বেঁচে গিয়েছিল তারা হয়তো পেরুতে গিয়ে নিজেদের ধাঁচে শহর তৈরি করেছিল। এমনও হতে পারে যে আটলানটিসের অধিবাসীরা দক্ষিণ, মধ্য আমেরিকা বা আফ্রিকাতেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তাই বোধহয় আটলানটিসের শহরের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়।

ডঃ ভ্যালেনটাইনের কাছ থেকে সব ভালো করে বুঝে নিয়ে আমরা বিমিনি এলাকায় দু'টো স্থান নির্বাচন করলুম। একটা হলো প্যারাডাইস পয়েন্টের কাছে বিমিনি রোড আর অপরটা হলো নর্থ বিমিনির পুব দিকে জলের নিচে একটা ত্রিকোণ এলাকা যেটা দেখে আমাদের মনে হয়েছিল একটি প্রাচীন জলাধার।

পাঁচ সপ্তাহ ধরে যন্ত্রপাতি নিয়ে জলে ডুবে এবং বিমান থেকে ফটো তুলে এবং আমাদের পর্যবেক্ষণ খতিয়ে দেখে আমরা সাব্যস্ত করলুম যে বিমিনি রোডের ধ্বংসাবশেষ কখনই ভূতাত্ত্বিক ব্যাপার নয়, এটা পুরোপুরি পুরাতাত্ত্বিক এবং এ বিষয়ে আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

আমরা ধ্বংসাবশেষগুলিকে পুরাতাত্ত্বিক বলছি কারণ আমরা যেসব পাথরের সারি দেখলুম সেগুলি সোজা, প্রায় সরল রেখায় আঠারশ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত। সমান্তরাল আরও দু'সার পাথর আছে, প্রতিটি তিনশ' ফুট লম্বা।

পাথরগুলি পরিষ্কার চৌকো বা আয়ত, কোনোটি বেশি মোটা, কোনোটি কম মোটা কিন্তু সামঞ্জস্য আছে। পাথরগুলি আলগা অবস্থায় আছে, সমুদ্রের নিচের স্তরে মাটি বা অন্য পাথরের সঙ্গে আটকে নেই। ঐ অঞ্চলে সমুদ্রের ধারে যে সকল প্রাকৃতিক পাথর রয়েছে তার সঙ্গে কোনো মিল নেই তার অর্থ জলে নিমজ্জিত পাথরগুলি অন্য জায়গা থেকে আনা হয়েছিল। পাথর সারি সমুদ্র উপকূলের সঙ্গে সমান্তরাল নয়। এই পাথরের সারিকে সমুদ্রের ধারে প্রাকৃতিক দেওয়ালরূপে বিশ্বাস করা যায় না।

বিমান থেকে যেসব ফটো তোলা হয়েছিল সেগুলিও পরীক্ষা করে একটা সুপ্রাচীন শহরের ধ্বংসস্তূপ বলে বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয় না। পিনো টুরোলা জলের নিচে যে সব ছবি তুলেছিল তার সঙ্গে বিমান থেকে তোলা ছবির সামঞ্জস্য আছে।

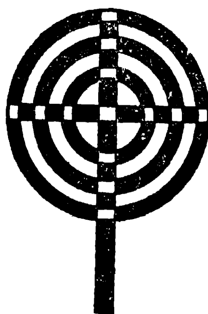
কয়েকশত একর জুড়ে এমন একটা ত্রিকোণ এলাকা দেখা গিয়েছিল যেটা একটা বিরাট জলাধার বলে মনে হয়। জলাধারের ধারে বাঁধের চিহ্নও রয়েছে। ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই ত্রিকোণ অংশটির চরিত্র ভিন্ন ধরনের, ওখানকার সমুদ্রের সঙ্গে খাপ খায় না।

আমাদের মাকাই-টু জাহাজে একজন ভবিষ্যৎ বক্তা (ক্লেয়ারভয়েন্ট) ছিলেন। সমাধি অবস্থায় তিনি একদিন বললেন, "তোমাদের নিচেই রয়েছে আটলানটিস। এর পুরানিদর্শনগুলি সময়ে আবিষ্কৃত হবে। এই দ্বীপের পুব দিকে কিছু আছে, সেদিকে দেখ। ওখানে যে কৃত্রিম জলপ্রণালী আছে সেটা দেখ"।

সেটি দেখতে গিয়ে আমরা পাথরে বাঁধানো একটি কূপ আবিষ্কার করেছিলুম। ডঃ ভ্যালেনটাইন বললেন, আইরিন হিউয়েজ নামে একজন ক্লেয়ারভয়েন্ট তাঁকে ঐ কূপটির বিষয় বলেছিলেন। পরে আরও একটা কূপ আবিষ্কৃত হয়েছিল।

এখানে সমুদ্রতল অগভীর। সমুদ্রতলে বালিতে তিরিশ ফুট পর্যন্ত খুঁড়ে পাথর পাওয়া যায় নি। তবে আমাদের কাজ এখনও শেষ হয় নি। অনেক কাজ বাকি আছে। আমরা আবার ফিরে যাব। এখনও পর্যন্ত আমরা যা

পেয়েছি বিশেষজ্ঞরা সেগুলি পরীক্ষা করে দেখছেন। যতটুকু তারা দেখে-ছেন তার ওপর ভিত্তি করে বলেছেন যে ওগুলো প্রাকৃতিক ধ্বংসস্তূপ নয় তবে যে দেশ ছিল সে দেশের সংস্কৃতি কেমন ছিল তা এখন বলা শক্ত। এইখানেই ডঃ ডেভিড ডি জিংকের বিবৃতি শেষ হয়েছে।



চার্লস বেরলিটজ বারমুডা ট্র্যাঙ্গল বই লিখে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। তিনি বিশ্বাস করেন আজ যে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের বিচিত্র ঘটনাগুলি ঘটছে একদা সেই এলাকাতেই আটলানটিস নামে এক সাম্রাজ্য ছিল।

১৯৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত তাঁর লেখা বই 'উইদাউট এ ট্রেস' নামে বইতে তিনি আটলানটিস সম্বন্ধে একটি পৃথক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির নাম লস্ট আটলানটিস ফাউণ্ড ইন দি বারমুডা ট্র্যাঙ্গল? হারানো আট-লানটিস কি বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলে পাওয়া গেছে?

আমরা এই প্রবন্ধের সারাংশ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পেশ করছি। বের-লিটজ লিখছেন যে এ কাহিনী তো আমরা আড়াই হাজার বছর থেকে সেই প্লেটোর মুখ থেকে শুনে আসছি যে আটলানটিস নামে এক মহাদেশ বা সাম্রাজ্য ছিল। কোথায় ছিল সেই মহাদেশ বা সাম্রাজ্য?

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলে আজ নানারকম অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটছে। ঘটনাগুলি নিরামিষ নয়, জাহাজ, বিমান হারিয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, মানুষও মরছে, ইংরেজিতে যাকে বলে ভায়োলেন্ট। তা সেই সুদূর অতীতে এইখানে যখন সেই দেশটি ছিল তখন আরও প্রচণ্ড ভায়োলেন্ট ঘটনা ঘটত যা একটা

দেশকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, একটা সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেইসব ধ্বংসকারী শক্তির কিছু এখনও রয়ে গেছে যার আঘাতে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল আজও ধ্বস্ত হচ্ছে। অবশ্য বহু ব্যক্তি আটলানটিস অথবা বারমুডা ট্র্যাঙ্গলের ঘটনায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আটলানটিক তলে গবেষণা চালিয়ে যেসব জানা যাচ্ছে তাও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না!

আটলানটিসেস কথা আমাদের প্রথম শোনান গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিত প্লেটো আড়াই হাজার বছর আগে, যা কেউ বিশ্বাস করে কেউ বিশ্বাস করে না। তারপর থেকে নানা ভাষায় আটলানটিস সম্বন্ধে পঁচিশ হাজার বই প্রকাশিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। মানব সভ্যতা যেদিন থেকে আরম্ভ বলে আমরা জানি তারও আগে কি অতি উন্নত এক সভ্যতা ছিল! এই হলো তর্কের বিষয়।

সেই আটলানটিসকে খুঁজে বার করবার জন্যে সমুদ্রের নিচে যেমন খোঁজা হচ্ছে তেমনি খোঁজা হচ্ছে মরুভূমিতে যা একদা সমুদ্র ছিল বলে বিশ্বাস। অনেক দ্বীপ খোঁজা হচ্ছে যেগুলি সেই নিমজ্জিত দেশের পর্বত চূড়া বলে অনুমান করা হচ্ছে। হয়ত সেই দেশের মানুষ ঐসব দ্বীপে আজও রয়ে গেছে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতেও খোঁজা হচ্ছে। দুই মেরু একদা মানুষের বাসযোগ্য ছিল। ওরা ক্রমশ উত্তরে ও দক্ষিণে সরে সরে গেছে তারপর তুষারাবৃত হয়েছে।

অ্যাটল্যাণ্টোলজিস্ট অর্থাৎ যাঁরা আটলানটিস নিয়ে গবেষণা করছেন তারা হারানো দেশটিকে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে পাওয়ার আশা রাখেন।

এজন্যে ২৭৫ জন গবেষককে প্রশ্ন করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ৪৬ জন এটাকে কাল্পনিক কাহিনী বলে মনে করেন, আসল দেশের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ১৩১ জন বলেন আটলানটিক সমুদ্রের নিচে নয় তবে ছিল; তাঁরা সম্ভাব্য চল্লিশটি জায়গার নাম করেছেন। এঁদের মধ্যে একজন ভেনাসের নাম করেছেন। ৯৮ জন বলেন প্লেটো যেখানে বলেছেন, আটলানটিস সেখানেই ছিল, এখন আটলানটিক সমুদ্রের নিচে ডুবে গেছে।

পৃথিবীকে আটলানটিসের খবর প্রথমে শোনান প্লেটো। প্লেটো হলেন

স্বনামখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। খ্রীঃ পূঃ ৪২৭-এ তাঁর জন্ম আর মৃত্যু ৩৪৭-এ। তিনি ছিলেন সোক্রেটিসের শিষ্য। প্লেটোকে তিনি আটবছর ধরে দর্শন পড়িয়েছেন। প্লেটো অনেক দেশ ঘুরেছেন। কিছুদিন কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, কিছুদিনের জন্যে ক্রীতদাসও ছিলেন। মুক্তি পেয়ে একটি অ্যাকাডেমি স্থাপন করেন যেখানে তিনি দর্শন শিক্ষা দিতেন। প্লেটো একদা নাটকও লিখতেন কিন্তু তাঁকে সোক্রেটিস কাছে এনে দর্শন শিক্ষা দিতে থাকেন।

আটলানটিস সম্বন্ধে প্লেটো কি লিখেছিলেন সে কথা আগেই বলা হয়েছে সেজন্যে এখানে সে প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া হলো বরঞ্চ বেরলিটজ আর কি বলেছেন দেখা যাক।

প্লেটোর পরবর্তী অনেক ভ্রমণকারী মিশর বা মধ্য আমেরিকা ভ্রমণ করে আটলানটিকের দুই পারে মহাপ্লাবনের নানা কাহিনী শুনেছেন এবং অনেকে এইসব দেশের জনসাধারণের মধ্যে আচার ব্যবহারে এবং চেহারায় কিছু সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছিলেন। ভ্রমণকারীদের মনে হয়েছিল এই সব মানুষ কোনো এক সময়ে কোনো এক দেশ থেকে এই সব বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর দীর্ঘদিন পার হয়ে গেছে, আগন্তুকরা স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে কিন্তু তারা তাদের আদি ভাষা ও সংস্কৃতি ভুলতে পারে নি, কিছু কিছু রয়ে গেছে।

আটলান্টিক মহাসমুদ্রের দুই ধারে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়া এইসব মানুষেরা কোথা থেকে এলো?

কলম্বাসের আগে যেসব ভ্রমণকারী আটলান্টিকের দুইধারে বা ভূমধ্য সাগর অঞ্চলের কয়েকটি দেশে ভ্রমণ করেছে তাদের কারও ধারণা আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে একদা কোনো এক দেশ ছিল সেই দেশ থেকেই মানুষ অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তারা মনে করে সেই মহাদেশ থেকেই সভ্যতা ইউরোপ, ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলিতে এবং মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

সুপ্রাচীন একটা সভ্যতা সম্বন্ধে ইউরোপের মানুষের এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে স্পেন দেশ থেকে অভিযানকারীরা যখন দক্ষিণ আমেরিকা বা মধ্য আমেরিকায় পৌঁছেছিল তারা আশা করেছিল যে নতুন দেশে তারা সেই সুপ্রাচীন দেশের সভ্যতার নিদর্শন দেখতে পাবে। অনুরূপভাবে মেক্সিকোর অস্তেক ও মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতার ভারবাহী তখনও যারা বেঁচেছিল তারা আশা করেছিল যে একদিন সমুদ্রের ওপার থেকে তাদের দেশে সেই সুপ্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী শ্বেত মানুষেরা তাদের দেশে একদিন আসবে।

তখন আমেরিকায় যাদের ইণ্ডিয়ান বা অ্যামেরিণ্ডিয়ান বলা হতো তাদের ধারণা ছিল যে তাদের আদি হারানো দেশ 'আজটলান' থেকে শ্বেত দেবতারা একদিন আসবেন।

আটলানটিস নামে যে একটা দেশ একদা ছিল তার সমর্থনে বলা যায়, যে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে একটা অবলুপ্ত মহাদেশের নাম শোনা যায়। বিভিন্ন ভাষীদের মধ্যে সেই নামের বিভিন্ন উচ্চারণ শোনা গেলেও একটা মূল ভিত্তি কিন্তু লক্ষ্য করা যায়।

সেইসব বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা সেই অবলুপ্ত দেশটিকে কি নামে অভিহিত করত এবং সে দেশের অবস্থান কোথায় বলে তারা বিশ্বাস করত তার একটা তালিকা দেওয়া হলো।

আমরা যে দেশটিকে আটলানটিস নামে অভিহিত করি সেই দেশের মানুষরা নিজেদের দেশের কি নাম দিয়েছিল তা আমাদের জানা নেই কিন্তু বিভিন্ন দেশ সেই অবলুপ্ত যেসব নাম দিয়েছেন সেই সকল নামের মধ্যে এ টি এল এবং এন অক্ষরগুলি লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা সেই দেশকে বলত আটলানটিস এবং তাদের বিশ্বাস দেশটি ছিল আটলানটিক সমুদ্রের বুকে কোনো এক স্থানে। আফ্রিকার উত্তর পশ্চিমে অ্যাটলাস নামে এক পর্বতশ্রেণী আছে। এই পর্বতশ্রেণীর খানিকটা অংশ আটলানটিক সমুদ্রের ভেতরে প্রবেশ করেছে। অ্যাটলাস নামটি প্রাচীন রোমানদের দেওয়া।

প্রাচীন ফিনিসিয় এবং কারথেজিয়রা দেশটিকে যথাক্রমে বলত আনটি-লিয়া বা আনটিলহা। তাদের বিশ্বাস দেশটি ছিল ফিনিসিয়দের গুপ্ত সমুদ্রপথে পশ্চিম আটলানটিক মহাসমুদ্রে।

মিশরিয়রা দেশটির নাম দিয়েছিল আমেনটি এবং তারা মনে করত সেটি দেশ নয়, স্বর্গ এবং তার অবস্থিতি পশ্চিম আটলানটিক সমুদ্রের মধ্যস্থলে।

ব্যাবিলন ও সুমেরিয়ার অধিবাসীদের ধারণাও মিশরীয়দের অনুরূপ ছিল তবে তারা সেই স্বর্গরাজ্যের নাম দিয়েছিল আরাল্লু। ওয়েলশের কেলটিক-রাও মনে করত দেশটি পশ্চিম সমুদ্রে অবস্থিত এক স্বর্গ। তারা সেই স্বর্গকে আভালন বলত। নরডিকরা যদিও স্বর্গরাজ্যের মর্যাদা দিয়েছিল এবং অবস্থান ধরে নিয়েছিল পশ্চিমে কোথাও কিন্তু তাদের দেওয়া নামটি অন্যরকম ছিল। তারা বলত ভালহাল্লা।

স্পেন দেশের কেলটিকরা বলত আনটিলিয়া বা আটলানটিডা এবং মনে করত দেশটি আটলানটিক সমুদ্রে কোথাও কিন্তু স্পেন থেকে বেশী দূরে নয়। বারবের এবং উত্তর আফ্রিকার প্রাচীন অধিবাসীরা মনে করত আফ্রিকার আরও উত্তর পশ্চিমে আটরানটিস বা আটলানটয় নামে যে দেশ আছে সেই দেশ থেকে রণহুংকার দিতে দিতে সেখানকার যোদ্ধারা ছুটে আসত। ওদের মধ্যে একদল অধিবাসী উত্তর পশ্চিম দিকে আট্রালা নামে একটা সুন্দর দ্বীপ আছে বলে মনে করত।

আরবরা মনে করত সে দেশ ছিল মহাপ্লাবনের পূর্বে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমে। সে দেশের নাম দিয়েছিল আড।

ক্যানারি দ্বীপের প্রাচীন গুয়াঞ্চে জাতি মনে করত আটালায়া নামে এক সুন্দর দেশ ছিল, সে দেশ আটলানটিক সমুদ্রে ডুবে গেছে। ক্যানারি দ্বীপ সেই দেশের অন্তর্গত একটি পাহাড় ছিল। এজন্যে ক্যানারি ডোবে নি, দ্বীপ হয়ে আজও জেগে আছে।

স্পেনের বাস্করা দেশটিকে বলত আটলায়েনটিকা। সে দেশ জলের নিচে ডুবে গেছে কিন্তু তারা অর্থাৎ বাস্করা ছিল সেই দেশেরই অধিবাসী।

মেকসিকোর অস্তেকরা বিশ্বাস করত তারা আজ্‌টলান বা আজ দেশ

থেকে মেকসিকোতে এসেছিল। সে দেশ পূর্ব সমুদ্রে অর্থাৎ অটলানটিক সমুদ্রে ডুবে গেছে। সে দেশে বিরাট এক পাহাড় ছিল।

মধ্য আমেরিকার মায়ারাও বলত তাদের মূল দেশ আজ্‌টলান বা আটলান। তারা সেই দেশ থেকেই মধ্য আমেরিকায় এসেছে। সে দেশ ছিল পূর্ব সমুদ্রে।

কাছেই টোলটেক জাতি বলত পুব সাগরে ট্রাপাল্লান নামে এক দেশ ছিল। সে দেশে সভ্য দেবতারা বাস করে।

উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূলের আদিবাসীরা বলত আটলান নামে পূর্ব সাগরে এক দেশ ছিল যেখান থেকে পূর্ব পুরুষরা এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল।

অবলুপ্ত দেশের এই সব নাম থেকে একটা ধ্বনি পাওয়া যায় 'আটল্‌' যার অর্থ জল। এই শব্দটি অস্তেকরাও ব্যবহার করত আবার উত্তর আফ্রিকার বারবেররাও ব্যবহার করত। মহাপ্লাবনে বা যে-কোনো কারণে দেশটি লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগে বা পরে ঐ 'আটল্‌' শব্দ থেকে আটলানটিস নামের একটা যুক্তি হয়তো খুঁজে পাওয়া যায়।

একদা আটলানটিক সমুদ্রে স্থলভাগ অনেক বেশি ছিল। অনেকগুলি দ্বীপ ছোট হয়ে গেছে, যথা কিউবা, বাহামা, বারমুডা, ক্যানারি ইত্যাদি। আমেরিকার ফ্লোরিডাও আগে আরও বড় ছিল। এমন পরিবর্তন আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না।

সাহারা মরুভূমি একদা সমুদ্র ছিল। অনেক সামুদ্রিক প্রাণীর অবশিষ্ট এখনও পাওয়া যায়। আটলানটিস নামে দেশটিও একদা ছিল, তার প্রায় সবটাই এখন জলের তলায়, কিছু কিছু অংশ এখানে ওখানে দ্বীপ হয়ে জেগে আছে। যারা সমুদ্রের নিচে ডুবে যাওয়া মাটি, বালি, পাথর ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা করেন তাঁরা দেখেছেন যে এই সব দ্বীপের মধ্যে একদা যোগ ছিল।

তবে একটা পুরো দেশ ছিল অথবা জাপান বা ইন্দোনেশিয়ার মতো দ্বীপের সমষ্টি ছিল কি না সে বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। সেই দেশের মানুষরা

সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতো। তারা গড়ে তুলেছিল এক উন্নত সভ্যতা। সেই উন্নত সভ্যতার নিদর্শন, প্রাসাদ, মন্দির, বন্দর, পাথরে বাঁধানো রাস্তা আজও জলে ডুবে আছে। কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তবে সেই সব প্রমাণ সকলেই মেনে নিচ্ছেন না।

আটলানটিস সভ্যতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হলে পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে কারণ আটলানটিস সভ্যতা মহেঞ্জোদড়ো, মিশর সুমেরিয়া, ব্যাবিলন সভ্যতা অপেক্ষা কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন।

আটলানটিক সমুদ্রের কয়েকটি দ্বীপে এবং পূর্ব উপকূলে কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। জল যখন পরিষ্কার থাকে তখন বিমান বা মাছ ধরা নৌকো থেকেও এগুলি দেখা যায়। ঐসব দ্বীপে পুরনো সভ্যতার এমন কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় যা স্থানীয় সভ্যতার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

কারও অভিমত হলো সেই প্রাচীন সভ্যতার পূর্বপুরুষ হলো ফিনিশিয়রা অথবা কলম্বাসের আগে যারা আমেরিকার পথে পাড়ি দিত তাদের কেউ কেউ হয়তো ঐ সব দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে থাকবে।

বিখ্যাত ওসেনোগ্রাফার ডঃ মরিস ইউইং বলেন তিনি আটলানটিক সমুদ্রের মাঝখানে একটি ডুবন্ত বাঁধ নিয়ে তেরো বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সেই মহাদেশের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণই তিনি পান নি অতএব সে দেশ থাকতে পারে না অতএব আটলানটিসের খোঁজ করা মানে সময় নষ্ট করা।

আরজেনটিনার একজন পণ্ডিত আরমানডো ভিভান্টে জে ইমবেলোনি আটলানটিস কয়েক বছর ধরে আটলানটিসকে খুঁজতে গিয়ে নিরাশ হয়ে বলেছেন ও দেশ কোনোদিনই ছিল না এবং খুঁজতে যাওয়া মানে বৃথা সময় নষ্ট। অথচ এঁরা দু'জনেই সময় নষ্ট করে বই লিখেছেন।

তবে গত কয়েক বছরে অনুসন্ধান চালিয়ে যে সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে আটলানটিক উপকথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। প্রথম ধাপের সন্ধান পাওয়া গেছে এখন বাকি ধাপ খুঁজে বার করতে

হবে, অবশ্য সকল পণ্ডিত এখনই একমত হবেন কি না বলা যায় না।

যে এলাকাটাকে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল বলা হয় সেই এলাকার মধ্যেই এই প্রাচীন দেশের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৫৮ সালে বিমিনি ও অ্যানড্রস দ্বীপের গা ঘেঁষে প্রথমে বিমান থেকে কিছু ধ্বসাবশেষ দেখা গিয়েছিল তারপর ডুবুরি নেমে দেখতে পেল পাথরের জেটি, রাস্তা, প্রাচীর এবং বাড়ি।

এইসব আবিষ্কৃত হবার অনেক আগেই নাকি স্থানীয় ডুবুরি ও জেলেরা এসব দেখেছিল তারা নাকি সাহস করে কিছু বলে নি। তারা ভাবত ভালো করে খুঁজলে এখানে জলের নিচে ঐ ধ্বংসাবশেষে হয়তো রত্নাগার পাওয়া যাবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ সমুদ্রের ওপর মাথা তুলে জেগে উঠেছিল। এই সময়েই যে জেগে উঠবে তা ১৯৪০ সালে কে সি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ১৯৫৮-৫৯ সালে আটলানটিসের পজিডিয়া অংশ জেগে উঠবে।

তিনজন নামী ওসেনোগ্রাফার ডঃ ম্যানসন ভ্যালেনটাইন, ডিমিট্রি রেবিকভ এবং জ্যাক মেয়ল নিজেরাই সমুদ্রের নিচে নেমে কিছু আবিষ্কার করেছেন তারপর বিমান থেকে সমীক্ষা চালিয়েছেন ট্রিগ অ্যাডামস এবং বব ব্রাশ। অ্যানড্রস-এর কাছে যেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি নিয়ে কয়েকখানি বই লেখা হয়ে গেছে। (বেরলিটজ নিজেই লিখেছেন—মিস্ট্রিজ অফ ফরগটেন ওয়ার্ল্ড)।

প্রথম দিকে তো কয়েকজন বিজ্ঞানী এই ধ্বংসাবশেষগুলি মানুষের তৈরি হতেই পারে না বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁরা যে মন্তব্য করেছিলেন তাও বিশ্বাস করা যায় না।

তারপর বারমুডা ট্র্যাঙ্গল নিয়ে যখন খুব হৈচৈ আরম্ভ, রহস্য ভেদ করবার উদ্দেশে যখন অনেক খোঁজাখুঁজি শুরু হলো সেই সময়ে সেই হারানো দেশের আরও কিছু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হলো। বাহামা, বিমিনি, অ্যানড্রস, একজুমা, কাইকস, বারমুডা প্রভৃতি দ্বীপের কাছে এমন কি ক্যানারি-

আইল্যাণ্ড, অ্যাজোরস দ্বীপ, উত্তর কিউবা অঞ্চলেও আবার ওদিকে ইউ-কেটান ও ভেনেজুয়েলার কাছে যে সব দেওয়াল, থাম, রাস্তা, জেটি, বাঁধ এমন কি ভাঙা কিছু মূর্তিও আবিষ্কৃত হলো। নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হলো এগুলি প্রাকৃতিক কিছু নয়, মানুষের হাতে তৈরি। তবে সে মানুষ কত-দিন আগে এগুলি তৈরি করেছিল তা জানতে বাকি আছে।

এইগুলি নিয়ে বেরলিটজ আরও একটি বই লিখেছেন—দি মিষ্ট্রি অফ আট-লানটিস।

বেশির ভাগ ধ্বংসাবশেষ এখনও পর্যন্ত বাহামার কাছে পাওয়া গেছে কারণ বেশি লোক এখানেই অনুসন্ধান চালিয়েছে। এখানেও রাস্তা, দেওয়াল, বাঁধ, বড় হলঘরের ধ্বংসাবশেষ থাম ইত্যাদি পাওয়া গেছে। যেসব পাথর দিয়ে এগুলি তৈরি সেরকম পাথর বাহামা দ্বীপে পাওয়া যায় না। সেগুলির আকার দেখেই বোঝা যায় যে কোনো মানুষ সেগুলি মাপমতো কেটে যথাস্থানে বসিয়েছে।

নর্থ বিমিনির কাছে নাকি বিমান থেকে পাইলটরা এবং ডুবুরিরা পিরা-মিডের মতো মন্দির দেখেছে। পিরামিডের অবস্থান ডুবুরিরা আগে গোপন রেখেছিল। তাদের কারও মতলব ছিল ডিনামাইট দিয়ে, সেই পিরামিড উড়িয়ে দিলে ভেতরে নিশ্চয় রত্নভাণ্ডার পাওয়া যাবে, মিশরে যেমন পাওয়া গেছে।

বাহামা সরকার টের পেয়ে ধ্বংসাবশেষগুলি রক্ষা করবার ব্যবস্থা করেছে। সরকার ফ্রিপোর্ট শহরে একটি মিউজিয়ম স্থাপন করেছেন। জল থেকে কিছু কিছু নিদর্শন তুলে সেই মিউজিয়ামে রাখা হচ্ছে।

জল থেকে তোলা কিছু ছোটখাটো নমুনা দেখে কেউ কেউ মন্তব্য করে-ছিলেন যে ওগুলি আগের যুগের পালতোলা জাহাজ থেকে পড়ে থাকতে পারে বা জাহাজটির অংশ বিশেষ ওগুলি কিন্তু ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে সেগুলি পালতোলা জাহাজের যুগের চেয়েও পুরাতন।

ডঃ কে সি ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে আটলানটিসের ধ্বংসাবশেষ সত্যিই যখন জেগে উঠতে আরম্ভ করল তখন ডঃ ভ্যালেনটাইন, লামার বিশ্ববিদ্যালয়ের

ডঃ জিংক এবং ডঃ জে থোর্ণ প্রমুখ বিখ্যাত ওসেনোগ্রাফাররা আগ্রহী হয়ে জলের নিচে অনুসন্ধান করে পাকাপাকিভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে যা তারা দেখেছেন সে সবই কোনো এক সময়ে মানুষের হাতেরই তৈরি, এ বিষয়ে তারা নিঃসংশয়।

কলম্বাসের আগে ফিনিশিয়া, রিওয়ান, আইরিশ ও ভাইকিংরা আটলানটিক পাড়ি দিত। তারা যদি ঐ সব ঘরবাড়ি, বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি তৈরি করে থাকে তাহলে তারা সেগুলি জলের তলাতেই তৈরি করেছিল কিন্তু এ তথ্য বিশ্বাস করা যায় না।

গত বারো হাজার বছরে আটলানটিক সমুদ্রের জলস্তর অনেক ওপরে উঠেছে ফলে অনেক দ্বীপ বা আমেরিকারও কিছু অংশ জলের নিচে চলে গেছে কিন্তু আটলানটিস কিভাবে ডুবে গেল সে বিষয়ে এখনও কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে নি।

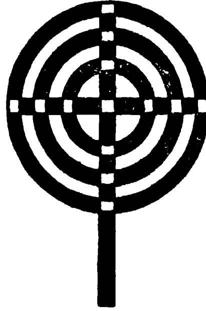
মহাভারতের যুগে হিন্দুরা নাকি পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার জানত। প্রাচীন আটলানটিসবাসীরাও কি সেই রকম কোনো অস্ত্র আবিষ্কার করে নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে এনেছিল ?

আটলানটিস ফাউণ্ড এবং দি সিক্রেটস অফ আটলানটিস বই দু'খানির লেখক জার্মান পণ্ডিত প্রয়াত অটো ম্যাক অনুমান করেন যে অতীতে কোনো গ্রহাণুর সঙ্গে সংঘাতের ফলে আটলানটিস ধ্বংস হয়েছে। মায়া পঞ্জিকা দেখে তিনি অনুমান করেছেন যে ঐ ঘটনা ঘটেছিল যীশুর জন্মের ৮৪৯৮ বছর পূর্বে।

আটলানটিস সভ্যতার রহস্য উদ্ঘাটিত হলে বোধহয় বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্যও একদিন উদঘাটিত হবে হয়তো। জলের নিচে এখনও হয়তো কোনো রহস্যময় শক্তি সক্রিয় থেকে ওপরে নানারকম বিপর্যয় ঘটাচ্ছে!

ক্যারিবিয়ান এবং পশ্চিম অ্যাটলানটিক সমুদ্র অঞ্চলে প্রচুর আগ্নেয়গিরি আছে, কয়েকটি এখনও কম বেশি সক্রিয় এবং এই অঞ্চলে প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড় জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে দেয়। কারিব ইণ্ডিয়ানদের ধ্বংসের দেবতার নাম হারিকান তাই থেকেই নাকি হারিকেন ঝড় নামাংকিত হয়েছে।

আগ্নেয়গিরি ও তৎসহ ভূমিকম্প এবং প্রচণ্ড ঝড় সহ্য করতে না পেরেই কি আটলানটিস ধীরে ধীরে সমুদ্রতলে তলিয়ে গেছে ?
সমুদ্রের নিচে অনেক কিছু ঘটছে যা আজও রহস্য। সমুদ্রের অনেক রহস্যের মতো আটলানটিসও এক রহস্য।



আটলানটিস সম্বন্ধে এতক্ষণ অনেক কিছু পড়া গেল, অনেক কিছু জানাও গেল। আরও কিছু শোনা যাক বা আলোচনা করা যাক।
শোনা যায় আটলানটিসকে উপলক্ষ্য করে যত বই প্রকাশিত হয়েছে এত বেশি সংখ্যক আর কোনো বিষয়কে উপলক্ষ্য করে প্রকাশিত হয় নি। এছাড়া প্রবন্ধ তো আছেই।
সমস্ত প্রবন্ধ বা বই পড়া একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু প্রচলিত কয়েকখানি বই পড়ে জানা যায়, যে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বা অ-পণ্ডিতরাও যারা নিরর্থক ভাবে নাক গলিয়েছে, এরা সকলেই আটলানটিসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন কিন্তু তার অবস্থান সম্বন্ধে সকলে একমত নয়। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর মধ্যে যে-কোনো জায়গায়, পৃথিবীর যে-কোনো কোণে এরা সেই রহস্যময় দেশের অবস্থান কল্পনা করেছেন, কারও যুক্তি অকাট্য মনে হবে, কারও যুক্তি কল্পনা বিলাস মনে হবে।
এদের অনেকের বই পড়ে মনে হয় আমরা সভ্য-যুগ বলে যে সময়সীমা পরিকল্পনা করি তারও আগে আর একটা সভ্যতা ছিল যে সভ্যতা সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা সত্যই কি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ?
সেই দেশ কি মূল গার্ডেন অফ ইডেন ? সেই দেশ ধ্বংস হবার আগে দু'চার

জন নরনারী কি এদেশে ওদেশে ছিটকে পড়ে তাদের ঐতিহ্য বহন করে নি ?

প্লেটো অনুমান করেছেন আটলানটিস ছিল হারকিউলিসের থামের পশ্চিমে অর্থাৎ বর্তমান জিব্রালটার প্রণালীর পশ্চিমে আটলানটিক সমুদ্রে। দেশটা কত বড় ছিল ? দেশ না মহাদেশ ?

একটা বড় দেশ ছিল ঠিকই এবং সেই বড় দেশ ঘিরে কয়েকটা ছোট বড় দ্বীপও ছিল। মূল দেশটার নাম ছিল পজিডনিস যার ধ্বংসাবশেষ ডঃ কেসির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে 'বাহামা বিমিনি বা অ্যানড্রস অঞ্চলে পাওয়া গেছে।

প্লেটোর ওপর অনেকে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন না। তাঁরা বলেন প্লেটোর পূর্ব নাম ছিল অ্যারিসটোক্লিস। আটলানটিসের প্লেটো শুনেছিলেন তাঁর মামার কাছ থেকে, সেই কাহিনী তিনি আবার অন্য ব্যক্তিদের বলেন অতএব হেরফের হয়ে থাকতে পারে। প্লেটো কি প্রমাণ পেয়েছিলেন ? যার ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর কাহিনী রচনা করেছিলেন ? তার তো কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আর একজন পণ্ডিত কি বলেন শোনা যাক। তিনি বলেন খ্রীস্টপূর্ব ৮৪৯৮ বৎসরের জুন মাসের ৫ তারিখে অ্যাসটিরয়েড-এ নামে একটি উপগ্রহ বা গ্রহাণু তার চলতি পথ ছেড়ে বেগে ছুটে এসে আটলানটিক সমুদ্রের বারমুডা ট্র্যাঙ্গল অঞ্চলে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে যেন তিরিশ হাজারটা অ্যাটম বোমা ফাটল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দেশ একটা সভ্যতা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এটি অনুমান করেছেন জার্মান লেখক অটো মাক। অটো মাক একজন বিজ্ঞানী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি স্নরকেল নামে সমুদ্রসন্ধানী একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন যা সাবমেরিন ও ডুবুরিদের খুব কাজে লাগে। এছাড়া তিনি গাইডেড মিসাইল রকেট আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তবে ভূতাত্ত্বিকরা বলেন গত ভূতাত্ত্বিক যুগের কোনো এক সময়ে আট-

লানটিক সমুদ্রের তলায় পুয়েরটো রিকো থেকে আইসল্যাণ্ড পর্যন্ত বিরাট এক ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে চার লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী এক দেশ সমুদ্রে ডুবে যায়। সেই দেশ কি আটলানটিস ? হতে পারে।

সমুদ্র তখন ফুটছিল, বিরাট বিরাট ঢেউ চারদিকে আঘাত হানছিল, লাভা স্রোতে আর দম বন্ধ করা গ্যাসে সব জীবিত প্রাণী তো আগেই মরে গিয়েছিল। কিছুই রইল না, রইল শুধু নিউ অ্যাটল্যানটিক বিজ নামে খ্যাত সমুদ্রগর্ভে একটা বাঁধ। সেই বাঁধের ওপর ন'টা দ্বীপ জেগে আছে। এই দ্বীপগুলি ছিল সেই দেশের সুউচ্চ পর্বতচূড়া যা মন্টব্ল্যাংক অপেক্ষা উঁচু ছিল। এদের মধ্যে অ্যাজোরস দ্বীপ একটি পর্বতচূড়া।

ভূগোলের ছাত্ররা গালফ স্ট্রিম নামে সমুদ্রস্রোতের নাম জানে। সেই স্রোত আগেও বইত কিন্তু বাধা পেত আটলানটিসে। এখন তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। এখন সে স্রোত বাধাহীনভাবে ইউরোপের উপকূল ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে।

ইলেকট্রিক ইল মাছ নাকি সে যুগেও ছিল। তাদের বাসা ছিল সারগাসো সমুদ্রের জলজ জঙ্গলে। ইল গিন্নিদের পেটে ডিম এলে তারা সেই ডিম পাড়তে যেত আটলানটিসের লবণহীন নদীতে ইলিশ মাছের ঝাঁক যেমন সমুদ্র থেকে গঙ্গা বা পদ্মায় আসে ডিম ছাড়তে।

কিন্তু এখন তো আর আটলানটিস নেই তাই ইল গিন্নিরা এখন দু'হাজার মাইল সাঁতার কেটে পশ্চিম ইউরোপের নদীতে চলে যায় তারপর সেখান থেকে ফিরে আসে সারগাসো সাগরে। ইল মাছেরা আজকাল বাসা বেঁধেছে ভূমধ্যসাগরে। সেখান থেকে যাত্রা করে। কারও মতে তারা ডিম পাড়তে যায় বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকায় তারপর কোথায় যায় কেউ জানে না।

আটলানটিসের সকলেই নাকি মরে নি। কেউ হয়তো বেঁচে গিয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়েছিল আবার অনেকে দ্বীপ ধ্বংস হয়ে যাবার আগে থাকতেই অন্য দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তাদেরই বংশধররা হয়তো আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা, মায়া সভ্যতার ধারকরা কিংবা ইউরোপে ক্রো-ম্যাগনন মানুষরা।

এদের মধ্যে নানা উপকথা চলিত আছে। সেই উপকথায় শোনা যায় কবে নাকি সূর্য নিবে গিয়েছিল, প্রলয় কাণ্ডে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ের গুহায় দৈত্য বাস করত। অন্য গুহায় বুঝি বামনরা বাসা বাঁধত।

আটলানটিক সমুদ্রের উভয় কূলে নানা দেশে প্রায় একই ধাঁচের পিরামিডের দেখা আজও পাওয়া যায়, মেকসিকো, মধ্য আমেরিকা, পেরু, মধ্যপ্রাচ্য, মিশর এমন কি ফ্রানসেও পিরামিডের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

এইসব দেশগুলির প্রচলিত ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যা ঐ সব দেশের সব ভাষাতেই পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিদ্যা, পঞ্জিকা, মাপজোখের মধ্যেও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

ষোড়শ থেকে বর্তমান শতাব্দীর মধ্যে গবেষকরা অনেক কিছু খুঁজে বার করেছেন যে সকল তথ্য কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। তবে যেসব তথ্য আগেকার মানুষ হেসে উড়িয়ে দিত এখন আর সেগুলি সরাসরি বাতিল করতে সাহস পায় না কারণ অনেক তথ্যের নতুন করে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, অনেক তথ্যের প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে।

টিয়াহুয়ানাকোর বিরাট মন্দিরের অস্তিত্ব কেউ জানত না। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব কোণ সমুদ্রে ডুবে গেল কিন্তু জেগে উঠলো উত্তর-পশ্চিম কোণ আর সেই সঙ্গে জেগে উঠলো টিয়াহুয়াকোর মন্দির।

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় অনেক প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হচ্ছে, যেগুলি পরীক্ষা করে মনে হচ্ছে মায়া বা অস্তেক সভ্যতা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন একটা সভ্যতা ছিল।

অনুসন্ধান চলছেই, চলবে। সমুদ্রের নিচের ব্যাপার-স্যাপার যাঁরা খোঁজ করেন তাঁদের তো আমরা সাধারণ কথায় বলি ওসেনোগ্রাফার। এঁরা ছাড়া কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আছেন যথা ভালকানোলজিস্ট, এঁরা খোঁজ করেন আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে, বর্তমানে নয়, অতীতে কবে কখন অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল, পেলিও মিনারেলোজিস্ট, অতীতে কি খনিজ পদার্থ ছিল, আজ তাদের চেহারা কি হয়েছে, তারা কত প্রাচীন, এ বিষয়ে তাঁরা খোঁজ নিচ্ছেন। তারপর আছেন পেলিও ক্লাইমেটোলজিস্ট, এঁদের কাজ হলো

সুদূর অতীতে পৃথিবীর আবহাওয়াটা কেমন ছিল। এরপর তো সাধারণ ভূতাত্ত্বিকরা আছেন, আছেন ভূমিকম্প বিশারদ, আছেন এমন ফটোগ্রাফার যাঁরা জলের তলায় উত্তম ছবি তুলতে পারেন এবং আরও অনেকজন যাঁরা নিজ ক্ষেত্রে এক্সপার্টরূপে পরিচিত।

ঐতিহাসিকরাও আছেন। তাঁরা ভারতের পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও দেশের নানা প্রাচীন গ্রন্থ মায়, জার্মান নিবেলাংস, ইলিয়াড এবং ল্যাটিন আমেরিকার চিলম বালম, পপুল ভু এবং ভোলুসপা ইত্যাদি খতিয়ে দেখছেন, প্রাচীন মহাদেশের কোথাও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় কিনা।

মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত জিওলজিস্ট ডঃ সিজেয়ার এমিলিয়ানি গালফ অফ মেকসিকোতে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়েছেন। তাঁর মত সুদূর অতীতে আমেরিকার উত্তরে অবস্থিত উইসকনসিন রাজ্যে স্তূপের পর স্তূপ যে তুষার জমেছিল সেই তুষার গলে মিসিসিপি দিয়ে প্লাবন বয়ে এসে আটলানটিক সমুদ্রের জলস্তর এত তুলে দেয় যে আটলানটিস ডুবে যায় এবং এ ঘটনা ঘটেছিল যীশুর জন্মের পূর্বে মোটামুটি আট হাজার বছর আগে। প্লেটোর সময়ের সময় প্রায় মিলে যায়।

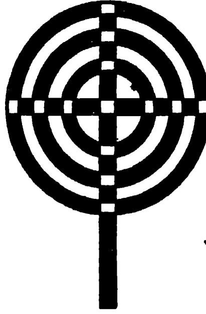
বারমুডা ট্র্যাঙ্গল অঞ্চলে আটলানটিকের গভীরে যে সব পাহাড় আছে সেই পাহাড়ে জিওলজিস্টরা অনেকগুলি বিরাট সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেছেন যে সুড়ঙ্গ প্রাকৃতিক বলে মনে হয় না। প্রাকৃতিক না হলে তাহলে কি মানুষ সেইসব সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিল ? তাহলে সেই মানুষদের অতুলনীয় শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল যাকে বলে জাইগ্যানটিক।

আটলানটিসের প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছে, রিসার্চ শিপ ও সাবমেরিন নিয়ে তারা উঠে পড়ে লেগেছে। তারা উপকথায় বিশ্বাস করে না, তারা বাস্তববাদী।

আটলানটিক মহাসমুদ্রে যেটা মিড-আটলানটিক রিজ নামে পরিচিত সেইখানে এমন বিরাট একটা ধ্বস নেমেছিল যে আটলানটিস জলে বসে যায়, সোভিয়েটরা এই তথ্যে বিশ্বাসী।

কোনো গ্রহাণু আটলানটিক অঞ্চলে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরেছিল বলে তারা

বিশ্বাস করছে না। তবে তাদের গবেষণা এখনও চলছে। যতদূর কাজ হয়েছে তা জানিয়ে রাশিয়ার এন এফ জিরভ আটলানটিস নামে একখানি চমৎকার বই লিখেছেন। আটলানটিস ধ্বংস হওয়ার যে সময় অটো ম্যাক নির্দিষ্ট করেছেন, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরাও সেই সময়টাই প্রায় মেনে নিয়েছেন।



প্লেটো বলেছেন আটলানটিস কোনো কল্পনা নয়। এমন একটা দেশ সত্য সত্যই ছিল। সে দেশের সমাজ-ব্যবস্থাও ছিল আদর্শ বলতে কি সক্রেটিস যে আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন এ যেন সেই রাষ্ট্র।

সমুদ্র থেকে বিশাল এক সমতলভূমি কয়েক শত মাইল এগিয়ে গিয়ে পার্বত্যভূমিতে শেষ হয়েছে। এমন উর্বরা আর এমন মনোরম সমতলভূমি সাধারণত চোখে পড়ে না।

সমতলভূমি যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে পাহাড় আরম্ভ। পাহাড়ের মাথাটা গাছপালায় ঘেরা চমৎকার একটা মালভূমি।

এই মালভূমিতে বাস করত ইউইনর নামে সুদর্শন এক পুরুষ সঙ্গে তার সুন্দরী স্ত্রী। স্ত্রীর নাম লিউসিপ্পি। তাদের একটি ফুটফুটে মেয়ে ছিল নাম ক্লিটো।

ক্লিটো যখন তরুণী তখন তার বাবা মা মারা যায়। যুবক পজিডন তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ক্লিটোও। প্রেমিক প্রেমিকারূপে ওরা দিন কাটাতে লাগিল।

পজিডন স্থির করল দেশ থেকে ওরা ওদের বাসভূমিটুকু পৃথক করে নেবে।

পজিডন প্রথমে নিজেদের বাসস্থান ও সংলগ্ন জমি ঘিরে মজবুত করে পাথরের দেওয়াল তুলে দিলো তারপর সমুদ্র থেকে খাল কেটে বাসভূমিকে ঘিরতে লাগল জ্যামিতিক বৃত্তাকারে। পর পর তিনটি বৃত্তাকার খাল দিয়ে বাসভূমিটি এমনভাবে ঘিরে দিলো যাতে কেউ সহজে তার বাসভূমিতে প্রবেশ করতে না পারে। মাপজোখ করে নিঁখুতভাবে বৃত্তাকার খালগুলি খোঁড়া হয়েছিল। তিনটি খাল একটি বড় খাল দিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যাওয়া আসার জন্যে মাঝে মাঝে খালের ওপর সেতু ছিল কিন্তু তাও সমদূরত্বে। সমস্ত ব্যাপারটা নকশা করে নির্দিষ্ট মাপ অনুসারে তৈরি করা হয়েছিল।

এই ত্রি-বৃত্তিক খালের নকশা আটলানটিসের প্রতীক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হতো। এটির নাম দেওয়া হয় ক্রস অফ আটলানটিস। যে সব স্থানে পশু বলি দেওয়া হতো সেই সব স্থানে এই প্রতীক চিহ্ন দেখা গেছে।

পজিডন ছিল দেবতা তাই বুঝি এসব কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। দেবতা ছিল বলেই সে তাদের বাড়ির উদ্যানে দু'টো ঝরণা তৈরি করল, একটা ঠাণ্ডা জলের আর একটা গরম জলের।

উদ্যানের জমি উর্বরা ছিল। সার দিয়ে তাকে আরও উর্বরা করে নানা রকম ফলফুল ও ওষুধের গাছ লাগাল। তাদের উদ্যান বাড়ি দেখে মনে হতো ছায়া সুনিবিড় শান্তির আশ্রম যেন। ডালে ডালে পাখি গান করত, বাগানে ছোট ছোট হরিণ চরত।

পজিডন ও ক্লিটো দু'জনে মিলে পর পর পাঁচ জোড়া যমজ শিশুর জন্ম দিলো। তারা ক্রমশ বড় হলো।

আটলানটিসের মূল দ্বীপটা পজিডন সমান দশ ভাগে ভাগ করল। নিজের বাড়ি জমি বাগান, যেটি হলো সবসেরা সেটি রাখল বড় দুই যমজের জন্যে। তারা সেখানে বাস করবে আর বাকি সব ছেলেদের বিভিন্ন প্রদেশ বা দ্বীপের শাসনকর্তা করে দিলো। সেই সব দেশের তারা রাজা হতে পারবে।

সব ছেলের নামকরণ করা হলো। বড় ছেলেকে যে দেশ ও সমুদ্র দেওয়া হলো

তার নাম আটলানটিক। বড় ছেলের নাম দেওয়া হয়েছিল অ্যাটলাস। তারপর কোনো ছেলের নাম দেওয়া হলো অ্যামফিয়ারস, কোনোটির নাম ইউইমন। কারও নাম মনেসিজ, কারও নাম অটোচথন। তারপর পর পর নাম হলো এলাসিপাস, মেসটর, আজিয়াম এবং শেষেরটির নাম ডায়াপ্রিপস।

এই সব সন্তানরা বংশ পরম্পরায় দেশ শাসন করেছিল, এদের সকলের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল পিলারস অফ হারকিউলিস থেকে আরম্ভ করে ইজিপ্ট এবং টিরেনিয়া পর্যন্ত।

অ্যাটলাস যে বংশ স্থাপন করেছিল তা অনেক পুরুষ ধরে চলেছিল। বংশের বড় ছেলে সব সময় রাজা হতো। এই বংশে অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সজ্জন ব্যক্তি রাজা হয়েছিল, অনেকেরই সাহস ও শক্তি ছিল অতুলনীয়। অ্যাটলাসের ধনভাণ্ডার ছিল সবার সেরা, নানা রত্ন ও মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ। রাজ্যের যা কিছু প্রয়োজন সে সবই তার নিজের রাজ্যেই পাওয়া যেত, খাদ্যে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রজারাও উৎপন্ন সামগ্রীর ভাগ দিত।

অ্যাটলাসের রাজ্যে একটা ধাতু পাওয়া যেত, সে ধাতু আজ পাওয়া যায় না। ধাতুর নাম ছিল অরিচাল্ক। ধাতুটি আকরিক কিন্তু মনে হয় তার সঙ্গে তামা, টিন, আরসেনিক, অ্যান্টিমণি ইত্যাদিও মিশে থাকত কিন্তু সেটি অ্যালয় বা সংকর ধাতু নয়। এমন ধরনের মিশ্রিত ধাতু কর্নওয়ালে আজও পাওয়া যায়। ঐ ধাতু নানা কাজে লাগত। এছাড়া উৎকৃষ্ট সোনা পাওয়া যেত। আসবাব তৈরির জন্যে কাঠের অভাব ছিল না।

পাহাড়ে, জঙ্গলে, জলাভূমিতে, নদীতে নানাপ্রকার জীবজন্তু, মদ ও অন্যান্য প্রাণী ছিল। অনেক গৃহপালিত পশু ছিল। হাতি ছিল মনে হয়।

সুগন্ধি ও ওষুধ উৎপাদনকারী নানারকম গাছ ও লতা ছিল। সুস্বাদু ফল হয়তো ছিল তবে নারকেল ছিল কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন। মূল খাদ্যশস্য কি ছিল? গম? যব? বলা যায় না তবে ডাল জাতীয় কিছুর চাষ করা হতো আর চাষ হতো তৈলবীজের। প্লেটোর বর্ণনা পড়ে মনে হয় আটলানটিস ছিল সুখের স্বর্গরাজ্য।

আটলানটিস স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ, দেশের সবরকম চাহিদা দেশ মেটাচ্ছে। জমি উর্বরা, সেচের জল প্রচুর, ফসল ফলাতে বেশি পরিশ্রম করতে হয় না অতএব লোকের হাতে সময় প্রচুর।

তখন দেশের লোক রাজপ্রাসাদ, মন্দির, বন্দর ইত্যাদি নির্মাণের দিকে মন দিলো।

ইউএনঅর আর তার স্ত্রী লিউসিপ্পি প্রথমে যে বাড়ি তৈরি করেছিল এবং যে বাড়ি ঘিরে জ্যামিতিক বৃত্তের মতো পর পর তিনটি খাল খোঁড়া হয়েছিল সেই বাড়ি ভেঙে তৈরি হলো রয়েল ক্যাসল, সেখানে নির্মিত হলো ক্লিটো এবং অন্যান্য পূর্বপুরুষদের স্মৃতিতে বিরাট এক মন্দির। ক্লিটোকে এখন দেওয়া হয়েছে দেবীর আসন।

এরপর খালের ওপর চারদিক ঘিরে মোট আটটি পুল নির্মিত হলো আর সমুদ্র থেকে সোজা যে খালটি খোঁড়া হয়েছিল সেই খাল আরও চওড়া ও গভীর করা হলো যাতে সেই খালে জাহাজ ঢুকতে পারে। যা কিছু করা হলো সবই নির্দিষ্ট মাপজোখ অনুসরণ করে।

যেসব মন্দির নির্মিত হয়েছিল তাদের স্থাপত্য ও শিল্পকার্য নাকি অতুলনীয়। মন্দিরগুলি রূপোয় মোড়া কিন্তু তাদের চুড়োগুলি সোনায় মোড়া। প্রতি বছর নির্দিষ্ট তারিখে বিরাট উৎসব হতো নানারকম পুজার আয়োজন করা হতো। মন্দিরের শিলিংগুলিতে হাতির দাঁতের অপূর্ব কারুকাজ, দেওয়ালে রূপো ও অরিচালক ধাতুর কাজ। স্তম্ভগুলি স্ফটিকের তৈরি। মাঝে মাঝে সোনার মূর্তি, পক্ষিরাজ ঘোড়ার মূর্তি। আর সেই খালে নাকি শত শত ডলফিন সাঁতার কেটে বেড়াতো।

মন্দির প্রাঙ্গণে ভূতপূর্ব রাজা ও রাণীর এবং খ্যাতিমান ব্যক্তিদের মূর্তি এবং নানারকম ফুলের গাছ উদ্যানের শোভা বর্ধন করত।

দ্বীপে গরম ও ঠাণ্ডা জলের ঝরণা ছিল। সেই ঝরণার জল খাল কেটে স্নানাগারে নিয়ে যাওয়া হতো। কয়েকটি উন্মুক্ত স্নানাগারও ছিল। স্নানাগারগুলি সাধারণ বা ধনী ব্যক্তিদের জন্যে নির্দিষ্ট করা থাকত। মেয়েদের জন্যেও পৃথক স্নানাগারের ব্যবস্থা ছিল।

স্নানাগার ব্যতীত ছিল জিমন্যাসিয়ম আর ছিল অশ্বারোহীদের জন্যে এরিনা। সেখানে অশ্বারোহণের নানা কৌশল শেখানো হতো।

শহরে অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি ছিল। বন্দরগুলি সর্বদা জমজমাট থাকত, ব্যবসায়ীদের অনেক জাহাজ এক বন্দর থেকে অপর বন্দরে যাওয়া-আসা করত। বলতে গেলে সর্বতোভাবে পুরো দেশটাই ছিল সমৃদ্ধশালী।

প্লেটো বলেছেন : আটলানটিসের প্রধান রাজ্যটির নাম ছিল পজিডন। সমস্ত রাজ্যটাই ছিল পার্বত্যময়। মাঝে মাঝে নদী ও হ্রদ ছিল। সারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও ছিল অতি মনোরম। নানারকম গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ অনেক বনভূমি ছিল। বন্য প্রাণীরা সেই বনে বিচরণ করত। গৃহপালিত পশুও ছিল কয়েকরকম। দেশে খাদ্যের কোনো অভাব ছিল না।

দেশের লোক কৃষিকাজ জানত, জমি ছিল উর্বরা, জলেরও অভাব ছিল না। সেচ ব্যবস্থা ছিল উত্তম, অনেক খাল খোঁড়া হয়েছিল। খালের জল ক্ষেতে ব্যবহৃত হতো আবার খাল দিয়ে নৌকো ভাসিয়ে পণ্য আমদানি রপ্তানি করা হতো। বন থেকে কাঠ ভাসিয়েও আনা হতো।

কৃষক জমি ও ফসল, সব কিছুর জন্যেই আইন ছিল। সেকালে সমস্যা ও জনসংখ্যা অল্পই ছিল অতএব লোকজন সন্তুষ্ট থাকত। দেশের শাসনব্যবস্থাও ছিল আদর্শ। জনসাধারণের জন্যে তো বটেই এমন কি রাজার জন্যেও কতকগুলি আইন ছিল যে আইন মানতে রাজা বাধ্য থাকতেন। আইনের প্রথম শর্ত ছিল রাজা যেন অযথা যুদ্ধে লিপ্ত না হয়।

সবই তো ছিল ভালো কিন্তু একতরফা সুখ বা দুঃখের জীবন কি মানুষের ভালো লাগে? আটলানটিসের মানুষের কোনো দুঃখ ছিল না। সর্বদা ও সর্বত্র সুখ আর সুখ এবং সুখ ও প্রাচুর্য বাড়তে লাগল। ক্রমশ পাপ প্রবেশ করল। যথেচ্ছ যৌনাচারে নরনারী ডুবে গেল। ভগবান আর সহ্য করতে পারলেন না তাই একদিন সারা আটলানটিসটাকেই ধ্বংস করে দিলেন।

প্লেটোর 'ডায়ালগ' বলে দু'হাজার বছর ধরে যা চলে আসছে তা এইখানেই শেষ হয়েছে। সেই মূল লেখা ছাপানো কুড়ি পৃষ্ঠার বেশি নয় কিন্তু সেই

কুড়িটি মাত্র পৃষ্ঠা অবলম্বন করে হাজার হাজার বই ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। মূল বিবরণী লিখেছিল সোলন। সোলনের বিবরণী শুনে লিখলেন প্লেটো কিন্তু সোলনের মূল বিবরণী কম লোকেই পড়েছে। আটলানটিসের বিপক্ষেও অনেক বই লেখা হয়েছে, অনেকেই ব্যাপারটা স্রেফ গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, আটলানটিসের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই চায় নি তথাপি আটলানটিসকে মানুষের মন থেকে কেউ মুছে দিতে পারছে না, পরন্তু আটলানটিস নিয়ে নানারকম গবেষণা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ধর্মসংক্রান্ত মহাকাব্য বা প্রাচীন কোনো নিদর্শন মানুষের মনে স্থায়ী আসন লাভ করে আসছে কিন্তু যার অস্তিত্বে অনেকে সন্দিহান সেই দেশ সম্বন্ধেই মানুষের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। একমাত্র কারণ হলো অজানাকে জানবার মানুষের চিরদিনের আগ্রহ।

আটলানটিক সমুদ্র নামটাই বা কোথা থেকে এলো? পৃথিবীতে অনেক দেশ রয়েছে যাদের নামানুসারেও সমুদ্র রয়েছে যথা ইণ্ডিয়ান ওসেন, চায়না সি, জাপান সি, পারসিয়ান গালফ, বলটিক সি ইত্যাদি কিন্তু আটলানটিক সমুদ্র বেচারার কোনো দেশ নেই। এইজন্যেই সন্দেহ হয় আটলানটিস নামে একটা দেশ ছিল। সত্যিই কি ছিল? প্লেটোর ডায়ালগ ছাড়া আটলানটিস সম্বন্ধে আর কোনো প্রমাণ নেই। প্যাসিফিক সমুদ্রের নামানুসারেও কোনো দেশ নেই যদিও কয়েকটি দ্বীপকে প্যাসিফিক আইল্যাণ্ড বলা হয়। তাহলে কি প্লেটো একটি আদর্শ দেশ বোঝাতে আটলানটিসের কল্পনা করেছিলেন?

প্লেটোর 'রিপাবলিক' বইখানির নাম তো সকলেই জানেন। আদর্শ দেশের একটা পরিকল্পনা প্লেটো রচনা করেছেন। এমন একটা দেশ যে সত্যিই ছিল সেটা জানাতেই কি প্লেটো আটলানটিসের কথা বলেছেন?

আটলানটিস নামে একটা দেশ ছিল। প্লেটো তা বিশ্বাস করেছেন। প্লেটো তাঁর আদর্শ দেশের সমর্থনে যদি আটলানটিসের পরিকল্পনা করে থাকেন তাহলে সে দেশকে তিনি আট হাজার বছর আগে সৃষ্টি করতেন না, বড়জোর কয়েকশত বছরের প্রাচীন করলেই পারতেন বলে মনে হয়।

তাহলে প্রশ্ন আটলানটিস ছিল কি ছিল না? এবং প্লেটোর রচনা আসল না নকল?

আটলানটিসের কাহিনী প্লেটোকে শুনিয়েছিল সোলন। সোলন সে কাহিনী শুনে এসেছিল প্রাচীন ইজিপ্টে। কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে সোলন ইজিপ্ট যায় নি। ভাগ্যিস প্লুটার্ক 'লাইফ অফ সোলন' বইখানা লিখে রেখেছিলেন নইলে সোলনকে হয় তো বাতিল করা যেত। প্লুটার্ক লিখেছেন খ্রীস্টপূর্ব ৫৭১ থেকে ৫৬২-এর মধ্যে সোলন ইজিপ্ট, সাইস এবং হেলিওপলিস ভ্রমণ করে এসেছেন। ফেরবার পথে সোলন সাইপ্রাস দ্বীপে রাজা ফিলোসাইপ্রাসের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন। সাইপ্রাস দ্বীপের শহর ইপিয়া নাম তার সম্মানে পরিবর্তন করে সোলয় রাখা হয়েছিল। পথে আরও দু'একটা দ্বীপ ঘুরে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬১ সালে এথেনসে ফিরে আসেন। এরপর সোলন আর দু বছর মাত্র বেঁচেছিল, এই দু'বছরের মধ্যে সে তার স্মৃতিকথা সম্পুর্ণ করে গিয়েছিল।

১৮৩৬ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় গাভেয়া পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো বড় বড় অক্ষর আবিষ্কৃত হলো। নতুন নয়, প্রাচীন। এইসব অক্ষর পুরাতত্ত্ববিদদের মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল।

অক্ষর ছাড়া একটা পাহাড়ের গায়ে বিরাট একটা মূর্তি খোদাই করা ছিল। মানুষের পুরো মূর্তি নয়, শুধু মাথা। দাড়ি আছে, মাথায় একটা হেলমেট আছে।

ব্র্যাখনি নামে একজন আরকিওলজিস্টের মতে স্থানীয় ব্যক্তিরা এই মূর্তিটিকে বলে 'জায়েন্ট অ্যাটলাস'। ব্রেজিলের একজন অপেশাদার আরকিওলজিস্ট বারনারডো সিলভিয়া র‍্যামোস এই অক্ষরগুলি সম্বন্ধে মনে করেন ওগুলি ফিনিশিয়দের লেখা। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ২৮০০ ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে অক্ষরগুলি খোদিত।

পাহাড়ের গায়ে যেখানে অক্ষরগুলি খোদাই করা হয়েছে সেখানে তো

মানুষের পক্ষে যাওয়াই দুরূহ, বলতে গেলে অসম্ভব, মানুষ গেলই বা কি করে আর অত বড় অক্ষরগুলো খোদাই করলই বা কি করে?

যে অক্ষরগুলি খোদাই করা আছে সেগুলি অনুবাদ করা হয়েছে। লেখা আছে :

টায়ারের ব্যাডেজার ফিনিশিয়াতে
জেঠ-রালের প্রথম সন্তান।

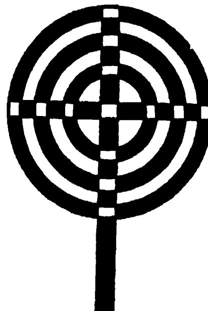
প্রাচীন পুঁথিপত্তর ঘেঁটে জানা গেছে যে খ্রীস্টপূর্ব ৮৫৬ সালে ব্যাডেজার পিতার মৃত্যুর পর 'টায়ারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্যত্র অনেক পুরাকীর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে; নিকথিরয়, ক্যামপোস এবং তিজুকাতে জলের নিচে কয়েকটি ভল্টের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্যারাহাইবা থেকে কিছু দূরে একটা নির্জন দ্বীপে একটি প্রাচীন দুর্গ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। কয়েকটি বড় হলঘর, লম্বা করিডর ও গ্যালারি এখনও চেনা যায়। কেউ বলেন এগুলি ফিনিশিয়দের তৈরি, তাদের স্থাপত্যরীতি এই রকমই ছিল; অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

সোলন যখন মিশরে গিয়েছিলেন তার তিনশ বছর পূর্বে খ্রীস্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে ফিনিশিয়রা নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছে, অনেক দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, দুর্গ ও প্রাসাদ তৈরি করেছিল কিন্তু তারা এসব হয় গোপন রাখত কিংবা তাদের বংশধরদেরও কিছু বলে যায় নি, কিছু লিখে রেখেও যায় নি কারণ সোলন যখন প্রাচীন ফিনিশিয়দের বিষয় নতুন তথ্যাদি আবিষ্কার করতে থাকে তখন সে সময়ের ফিনিশিয়রা তাদের পূর্ব পুরুষদের কীর্তির বিষয় অজ্ঞ ছিল। কিংবা এমনও হতে পারে যে ব্যাডেজার নিরুদ্দেশ যাত্রা করে দক্ষিণ আমেরিকার কাছে ঐ দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে আর দেশে ফিরে আসেন নি।

এই সময় কার্থেজ বা অন্য দেশ থেকেও ভ্রমণকারীরা সমুদ্র যাত্রা করত। কেউ ফিরে আসত কেউ ফিরে আসে নি। যারা ফিরে এসেছে তাদের কাছ থেকে সোলন তথ্য সংগ্রহ করত। তাদের কাছ থেকেই সোলন আটলানটিসের কাহিনী শুনে থাকবে।

সোলন আটলানটিসের যে বিবরণী দিয়েছিল তা মোটেই কাল্পনিক নয়, কিন্তু প্লেটোর বিবরণীতে কিছু কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

প্রাচীনকালে তদানিন্তন পণ্ডিতেরা আটলানটিসের অস্তিত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করতেন, কিছু বিবৃতি দিতেন বা কিছু লিখেও রাখতেন। তখন পৃথিবী খুব ছোট ছিল অর্থাৎ অনেক দেশ তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। অথচ প্রাচীন হিন্দু ও ফিনিশিয়রা ল্যাটিন আমেরিকা পর্যন্ত গিয়েছিলেন, তার অনেক প্রমাণ বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে। অথচ পুরনো যেসব মানচিত্র পাওয়া যায় তাতে আটলানটিক সমুদ্রের ওপারে কোনো দেশের মানচিত্র পাওয়া যায় না। এশিয়ার অধিকাংশ বা প্রশান্ত মহাসাগরের অস্তিত্ব তখন গ্রীস ইত্যাদি সভ্য দেশের মানুষেরা জানত না অথচ তাদের পূর্বেই এশিয়ার অনেক দেশ সভ্য হয়েছে।



আটলানটিস সম্বন্ধে সোলনের বিবৃতি ও প্লেটো বর্ণিত সেই হারানো দেশ সম্বন্ধে প্রাচীন কয়েকজন গ্রীক পণ্ডিত আলোচনা করেছেন। এমন একটা দেশ যে থাকতে পারে তা তাঁরা বিশ্বাস করেছেন কিন্তু তারপর আটলানটিস সম্বন্ধে সবাই নীরব। আর কোনো গ্রীক পণ্ডিতের নাম শোনা যাচ্ছে না যাঁরা আটলানটিস সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন।

হেরোডোটাস কিছু উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন আফ্রিকার উত্তর পশ্চিমে “পিলার অফ হেভেন” নামে এক পর্বতমালা আছে। মনে হয় তিনি অ্যাটলাস পাহাড়ের কথা বলেছেন। হেরোডোটাস লিখেছেন ঐ

পাহাড় অঞ্চলে যারা বাস করত তারা "আটলানটিয়ান" নামে পরিচিত ছিল, এখন তারা আর সেখানে নেই।
থিওপমপাস নামে আর একজন গ্রীক ঐতিহাসিক পশ্চিমে এক দেশের উল্লেখ করেছেন। সে দেশে মেরোপিয়ানরা বাস করে এবং সে দেশ শাসন করে মেরোপ নামে একজন রাণী। মেরোপ হলো লিবিয়ার দৈত্য অ্যাটলাসের কন্যা যে অ্যাটলাস পৃথিবীকে তার নিজের স্কন্ধে বহন করছে।
থিওপমপাস যেখানে মেরোপিয়ানদের দেশ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন, আটলানটিসও সেইখানেই ছিল। দেশ একই শুধু নামের তফাত।
পমপোনিয়স মেলা এবং প্লিনি জাহাজ ভর্তি একদল মানুষের কথা লিখেছেন: জাহাজখানা বুঝি আটলানটিক মহাসমুদ্রের মুখে পড়েছিল তারপর বিপথে চলে এসেছিল। মেলা এবং প্লিনি উভয়েই সেই জাহাজের মানুষদের দেখেছিলেন, তাদের দেহের বর্ণ লাল, পুরু ঠোঁট, খাড়া নাক, মাথা লম্বা মতো। তারা মনে করেছিলেন প্লেটো তার আটলানটিসের কাহিনীতে এই মানুষদের কথা লিখেছেন।
তারপর তো বহু শত বছর অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু আটলানটিস সম্বন্ধে সকলে নীরব। মধ্যযুগে তো আটলানটিসের কোনো নামই শোনা যায় নি। মধ্যযুগের মানুষেরা আটলানটিসের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত না।
তার একটা কারণ আছে। মধ্যযুগ অর্থাৎ তখন খ্রীশ্চান যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে। বাইবেল সে যুগের বেদ। বাইবেলে বলা আছে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ভগবান, তার আগে কিছু ছিল না। পৃথিবী যেদিন সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকে ইহুদিরা বছরের হিসেব রেখে আসছে। বুক অফ জেনেসিস মতে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ৫৫০৮ সালে।
কিন্তু প্লেটো লিখেছেন ন হাজার বছর আগে অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার চার হাজার বছর আগে আটলানটিস নামে এক সুসভ্য দেশ ছিল।
মধ্যযুগের খ্রীশ্চানরা এ কথা বিশ্বাস করতেই পারে না। পৃথিবী নিজে যদি পাঁচ হাজার বছর আগে সৃষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তার চার হাজার বছর আগে একটা সভ্য দেশ কি করে থাকতে পারে? যদি কোনো বইয়ে

এমন কথা লেখা থাকে সে বই বাতিল করা হোক।
বর্তমানে অবশ্য মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। বাইবেলের উপদেশ ব্যতীত সব কাহিনী ধ্রুব সত্য বা যথাযথ বলে মেনে নেওয়া হয় না, তার বিভিন্ন ব্যাখ্যাও করা হচ্ছে এবং পৃথিবী সৃষ্টির যে তারিখ ইহুদিরা নির্ধারিত করেছে সে তারিখ যে ঠিক নয় তাও সকলেই জানেন।

মোটামুটি পাঁচশ বছর আগেও সভ্য জগতের মানুষ পৃথিবীর পুরো চেহারাটা জানত না। প্রাচীন যুগের ও মধ্যযুগের পৃথিবীর ধারণাটা ভেঙে দিয়ে নতুন যুগের সৃষ্টি করল যে মানুষটি তার নাম ক্রিস্টোফোরো কলমবো। ইটালির জেনোয়াতে তার বাস। স্পেনের লোকেরা তাকে বলত ক্রিস্টোবাল কোলন কিন্তু মানুষটি কলম্বাস নামেই পরিচিত।
তার সমসাময়িক মানুষেরা তাকে মূর্খ বলত। লোকটা যা বলছে তা আবার হয় নাকি ? অসম্ভব পাগল। তাকে সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত।
কলম্বাস বলত যদি কেউ দীর্ঘদিনের জন্যে তৈরি হয়ে সমুদ্রযাত্রা করে পশ্চিম দিকে তাহলে সে এশিয়ার খিড়কি দরজা চীন ও জাপানে একদিন পৌঁছবে আর সেখান থেকে সে যেতে পারবে মসলা দ্বীপ মলাক্কা।
ইটালির লোকে তাকে পাগল বলে পাত্তা না দিলেও স্পেনের লোকেরা কিন্তু তার কথা উড়িয়ে দিলো না। সমুদ্রপথ ও সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে তাদের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। তাদের প্রতিবেশী পোর্তুগিজরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, বলতে কি তাদেরই আধিপত্য বেশি।
পোর্তুগিজরাও কলম্বাসের কথা শুনেছিল কিন্তু তারাও কলম্বাসকে উৎসাহ দেয় নি কারণ কলম্বাস যদি মসলা দ্বীপে পৌঁছতে পারে তাহলে সমুদ্র-পথে তাদের আধিপত্য হ্রাস পাবে। ইটালি বা স্পেন তাদের বাধা দেবে অতএব কলম্বাসের ব্যাপারে তারা চুপচাপ রইল।
কলম্বাস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে মসলা দ্বীপে যাবেই কিন্তু জাহাজ চাই, দুঃসাহসিক নাবিক চাই, অর্থ চাই কিন্তু কলম্বাস কোনো দিকেই আশার আলো দেখতে

পাচ্ছে না।

কিন্তু একজন লোক কলম্বাসকে বরাবর উৎসাহ দিয়ে এসেছে। লোকটির নাম টসচানেলি, ফ্লরেন্সের বাসিন্দা। সে কলম্বাসকে নানা ভাবে সাহায্য করত, আর্থিক দিক থেকে নয় কারণ তার টাকা পয়সা ছিল না, সমুদ্রপথ সম্বন্ধে নানা পরামর্শ দিত। তাছাড়া কলম্বাসের হয়ে ধনী ব্যক্তিদের কাছে ওকালতী করেছে, সাহায্য করতে বলেছে। কলম্বাসকে অনেক বই দিয়েছে, প্রাচীনকালের নাবিকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনিয়েছে এবং কলম্বাসও উৎসাহিত হয়েছে।

ফ্লরেন্স থেকে টসচানেলি কলম্বাসকে একখানা চিঠি লিখেছিল এবং কি করে লিসবন থেকে যাত্রা করে অ্যান্টিলা হয়ে সে কি করে সিপাঙ্গু (জাপান) পৌঁছবে তার একখানা ম্যাপও দিয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় ম্যাপখানা হারিয়ে গেছে।

পোর্টুগালের রাজা দ্বিতীয় জনের কাছে কলম্বাস কিছুদিন চাকরি করেছিল। মসলা দ্বীপ আবিষ্কারের জন্যে রাজার সাহায্যও চাইল কিন্তু রাজা জন কোনো উৎসাহ দেখান নি।

পোর্টুগাল থেকে নিরাশ হয়ে কলম্বাস স্পেনে এসে রাণী ইসাবেল ও রাজা ফার্ডিনাণ্ডের সঙ্গে দেখা করে তার আর্জি পেশ করল। রাণী রাজি হলেন এবং কলম্বাসকে সাহায্য করতে রাজি হলেন কিন্তু একটা চুক্তিও হয়েছিল।

তারপর তো সকলেই জানেন যে কলম্বাস তিনটি জাহাজ সান্টা মেরিয়া, নিনা এবং পিন্টা ও অষ্টআশিজন নাবিক নিয়ে ১৪৯২ সালের ৩ অগস্ট তারিখে পালোস বন্দর থেকে যাত্রা করেন।

সেদিন বিদায় জানাবার জন্যে বন্দরে মোটেই ভিড় হয় নি, ভিড় হয়েছিল যখন কলম্বাস ফিরে এসেছিল। এই অভিযান যে তাকে কোথায় নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে কোন্ দরজা খুলে দেবে সে বিষয়ে কলম্বাসের নিজেরও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

কয়েক মাস অনিশ্চয়তার পর ১২ অকটোবর কলম্বাস বাহামা দ্বীপপুঞ্জের

অন্তর্ভুক্ত গুয়ানাহানি বা ওয়াটলিং দ্বীপে পৌঁছলেন। কিন্তু তিনি জানেন না কোন্ দেশে তিনি পৌঁছেছেন এবং এদেশের কথা ১৮০০ বছর আগে প্লেটো লিখে রেখে গেছেন। এদেশ যে আমেরিকার কাছেই তাও তিনি জানতেন না।

কলম্বাস তিন বার যাত্রা করেছিলেন। দ্বিতীয়বার আবিষ্কার করেছিলেন জ্যামাইকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং তৃতীয় বার ট্রিনিডাড ও অরিনকো নদীর মোহানার কাছে আমেরিকার মূল ভূখণ্ড ব্রেজিল আবিষ্কার করে-ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যে তিনি সিম্পাঙ্গু (জাপান) অথবা কাথাই (চীন) দেশে এসেছেন। একসার ফ্লেমিঙ্গো দেখে মনে করেছিলেন ওরা বুঝি বৌদ্ধ পুরোহিত। মৃত্যুর সময়ও তিনি জানতেন না যে তিনি পশ্চিম দিকে এসেছেন, পুব দিকে নয়। কারও মতে কলম্বাসের ধারণা হয়েছিল তিনি ইণ্ডিয়া আবিষ্কার করেছেন তাই আমেরিকার আদিবাসীদের তিনি ইণ্ডিয়ান বলতেন।

কলম্বাসের এই বিরাট আবিষ্কারের ফলে পশ্চিম সমুদ্রের দরজা খুলে গেল। ১৫০২ খ্রীস্টাব্দ থেকে বড় বড় সব নৌবহর অভিযান চালাল। আপাতত তাদের দৃষ্টি মধ্য আমেরিকার দিকে যাকে আমরা আজকাল ল্যাটিন আমেরিকা বলে থাকি।

সেখানে নাকি সোনায় মোড়া এল ডোরাডো নামে শহর আছে। সোনার লোভে ছুটল স্বর্ণ শিকারীর দল। ১৫২১ খ্রীস্টাব্দে হারনানডে কর্টেস টেনোচটিটলান এবং শক্তিশালী অস্তেক সাম্রাজ্য জয় করে নিল। তারপর ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রানসিসকো পিজারো পেরু অর্থাৎ ইনকাদের দেশ জয় করল। এরা অবাধে লুটপাট চালিয়ে অনেক প্রাচীন নিদর্শন ধ্বংস করেছে যেগুলি রক্ষিত হলে অস্তেক, মায়া এবং ইনকা সভ্যতার চাই কি আটলানটিসের বিষয় ঐতিহাসিক তথ্য জানা যেত।

১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে মারকেটরের মানচিত্র প্রকাশিত হলো। পৃথিবীর চেহারা তখন অনেক বদলে গেছে। আটলানটিসের বিষয় মানুষ এতদিন ভুলে ছিল। নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে আটলানটিসের জন্যে

কোনো কোনো ব্যক্তির মনে আগ্রহের সঞ্চার হলো। দেশটা থাকলেও থাকতে পারে।

স্পেনের একজন ঐতিহাসিক ফ্রানসিসকো লোপেজ ডা গোমারা ১৫৫৩ সালে নব আবিষ্কৃত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপগুলি নিয়ে একখানি বই লিখলেন। এই বইতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে আটলানটিস এবং প্লেটো বর্ণিত পশ্চিম আটলানটিক সমুদ্রের কাহিনীও লিখলেন।

ডা গোমারা মনে করলেন আমেরিকাই প্লেটো বর্ণিত আটলানটিস, আমেরিকা না হলেও ওর পুবের দ্বীপগুলির সমষ্টিও সেই দেশ হতে পারে।

এতদিন আটলানটিস কাহিনীকে সকলে প্লেটোর কল্পনা মনে করত কিন্তু ডা গোমারার বই প্রকাশিত হবার পর এখন অনেকে আগ্রহী হলেন। অনেকে ডা গোমারার যুক্তি মেনে নিলেন।

নোভা আটলানটিস নামে ফ্রানসিসকো বেকন একখানা বই লিখলেন। তাঁর মতে ব্রেজিল হলো সেই হারানো দেশ আটলানটিস। জেনাস জোয়ানেস বার্চেড এই মত সমর্থন করলেন।

জেস্যুট ফাদার আথানেসিয়াম কারচার সকলকে বিস্মিত করে একখানা বই প্রকাশ করলেন। সে বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে। তিনি লিখলেন অ্যাজোরস দ্বীপগুলি আসলে পাহাড়ের মাথা। এখানেই ছিল আটলানটিস, দেশটা ডুবে গেছে কিন্তু পাহাড়ের মাথাগুলো ডোবে নি। আটলানটিসের একটা আনুমানিক মানচিত্রও তিনি তৈরি করেছিলেন। তাঁর মতে দেশটা ছিল অনেকটা ন্যাসপাতির মতো। আটলানটিস সমুদ্রের কতটা গভীরে ডুবে গিয়েছে তাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। যে যুগে সমুদ্রের গভীরতা মাপবার কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না অথচ তিনি কি করে আটলানটিক সমুদ্রের গভীরতা প্রায় নির্ভুলভাবে কি করে অনুমান করলেন সে এক বিস্ময়। কারচারের বইখানিকে আজও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এরপর বিভিন্ন লেখক ও গবেষক বিভিন্ন স্থানে আটলানটিসের অস্তিত্ব অনুমান করতে লাগলেন। যথা ওলাউস রুডবেক বললেন বর্তমান সুইডেন

হলো আটলানটিস। বারতোলি বললেন সুইডেন তো অসম্ভব, ইটালিই হলো সেই দেশ।

জর্জ ক্যাসপার কার্চমেয়ার অনুমান করলেন দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সিলভেন বেলি অনুমান করলেন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উত্তরে স্পিটসবার্জেন হলো সেই দেশ।

ডেলিসলেস ডি সেলস বললেন আটলানটিস ছিল ককেশাস-আরমেনিয়া পাহাড় অঞ্চলে, বেয়ার বললেন এশিয়া মাইনর, বালচ বললেন ক্রীট দ্বীপ। এইভাবে বিভিন্ন গবেষক ও বিভিন্ন লেখক সেই হারানো মহাদেশকে নিজ নিজ অনুমান মতো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তার অস্তিত্ব নির্দেশ করতে লাগলেন। স্পেন উত্তর আফ্রিকার অ্যাটলাস পাহাড়, সাহারার বুকে একটি ওয়েসিস, হেলিগোল্যাণ্ড এমন কি শ্রীলংকাও বাদ গেল না।

অতএব দেখা যাচ্ছে জেসুট ফাদার কারচার ব্যতীত প্লেটোর সঙ্গে কেউ একমত নন। পরে অবশ্য বেশ কয়েকজন গবেষক প্লেটোর সঙ্গে একমত হয়েছেন।

হাইনরিখ স্লিম্যানের নাম অনেকেই জানেন। তিনি নিজে কোনো পুরাতত্ত্ব-বিদ ছিলেন না কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন ট্রয় নামে সত্য সত্যই একটা দেশ ছিল। সবটাই হোমার বর্ণিত কাল্পনিক কাহিনী নয়। হেলেন, ইউলিসিস, হেকটর, মেনেলাউস, পেনিলোপি প্রভৃতি চরিত্র সত্যই ছিল। স্লিম্যান মাটি খুঁড়ে ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন।

সেই স্লিম্যানও বিশ্বাস করেন যে আটলানটিস নামে দেশ তো ছিলই এবং প্লেটো যেখানে বলেছেন সেইখানেই ছিল।

স্লিম্যানের নাতি সকলকে অবাক করে দিলো।

স্লিম্যানের নাতি ডঃ পল স্লিম্যান ১৯১২ সালের ২০ অকটোবর তারিখের নিউ ইয়র্ক আমেরিকান পত্রিকায় এক চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি লিখলেন যে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর বিখ্যাত ঠাকুরদার কাছ থেকে কিছু কিউরিও পেয়েছেন। এই কিউরিওগুলির মধ্যে একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত

পাত্র আছে। এই পাত্রটিতে ফিনিশয় হরফে লেখা আছে "ফ্রম কিং ক্রনস অফ আটলানটিস", আটলানটিসের রাজা ক্রনসের উপহার।

ডঃ পল স্লিম্যান দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন দেশ টিয়াহুয়ানাকোর কিছু প্রাচীন নিদর্শন দেখেছেন। এসবের সঙ্গে নাকি প্রাচীন আটলানটিসের শিল্পকর্মের সঙ্গে মিল আছে।

ডঃ স্লিম্যান পরে রাশিয়ায় চলে যান। তাঁর ঠাকুরদা হাইনরিখ স্লিম্যান প্যাপিরাসে লিখিত ছ'খানা প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন। পুঁথি ছ'খানি পাওয়া গিয়েছিল সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি সংগ্রহশালায়। ডঃ পল স্লিম্যান বলেন যে এই পুঁথি পড়ে জানা যায় যে মিশর একটা আটলানটিসের উপনিবেশ ছিল।

ডঃ স্লিম্যান আরও বলেছেন যে গ্রীসের মাইকেনিতে যে লায়ন গেট আবিষ্কৃত হয়েছিল তাতে যে লিপি আছে তা পড়ে জানা যায় যে সাইসের প্রথম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন মিসোর যিনি হলেন সকল মিশরীয়ের পিতা। আর এই মিসোর হলো আটলানটিসের এক পুরোহিতের পুত্র। ঐ পুরোহিত অর্থাৎ মিসোরের বাবা আটলানটিসের রাজা ক্রনসের সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে নীল নদের উপত্যকায় পালিয়ে এসেছিলেন।

অ্যাটলাস পাহাড় অঞ্চলে কিছু কিছু কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে যা আটলানটিসের প্রচলিত কাহিনীগুলি সমর্থন করে।

আটলানটিস রহস্য ভেদ করবার জন্যে কয়েকজন ফরাসি গবেষক উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এদের মধ্যে অ্যাবি মরিউর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুবিদিত। তিনি প্লেটোর কাহিনী সমর্থন করেও নানা যুক্তি উপস্থিত করে দেখিয়েছেন যে আটলানটিস অলীক নয়, সত্যই ছিল। আর একজন পণ্ডিত লিউইস স্পেন্স লাভা স্তর পরীক্ষা করে বলেছেন যে তেরো হাজার বছর আগে আটলানটিস ধ্বংস হয়েছে। তেরো হাজার বছর আগে একটা দেশের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। আটলানটিস থেকে অনেক নরনারী ইউরোপে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, স্পেন্স এ কথাও বলেন।

আর একজন ফরাসি পণ্ডিত এব্রাহিন দি শ্যাডো অফ আটলানটিস নামে

একখানি বই লিখেছেন, বইখানি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৯ সালে। তিনিও নানাভাবে আটলানটিসের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরও মত যে বিরাট এক ধূমকেতু বা উল্কার আঘাতে আটলানটিস ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং এক মহাপ্লাবনের সৃষ্টি হয়েছিল।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্যজনক ঘটনাগুলি আজকাল সকলের জানা আছে। এই এলাকায় জলের নিচে যে সব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির বয়স খ্রীস্টপূর্ব বারো হাজার বছর পুরনো বলে নির্ধারিত হয়েছে। পেরুর প্রাক-ইনকা সভ্যতার ইংলণ্ডে, স্টোনহেঞ্জ, প্রাচীন গ্রীসের অনেক স্থাপত্যের সঙ্গে জলের তলায় ডুবে থাকা নিদর্শনগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেছে। এমন কি পিরামিড আকৃতিরও নমুনা পাওয়া গেছে। এইসব বিষয় বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এবং উইদাউট এ ট্রেস বইয়ের লেখক যা বলেছেন তা আগেই লেখা হয়েছে।

প্রাচীন আটলানটিসের অধিবাসীরা কোনো এক রকম স্ফটিক থেকে তাদের শক্তি সংগ্রহ করত, সেই শক্তি বর্তমান বৈদ্যুতিক শক্তির মতো তাদের সব প্রয়োজন মেটাত।

বর্তমানে কেউ মনে করেন বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকায় জলের নিচে কোথাও একটা স্ফটিক স্তম্ভ আজও লুকিয়ে আছে এবং সেটি আজও সক্রিয়। বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকায় সব রহস্যের জন্যে এই স্ফটিক স্তম্ভ দায়ী।

ভূগোলের ছাত্ররা গালফ স্ট্রিম নামে সেই বিখ্যাত সমুদ্র স্রোত সম্বন্ধে জানে। এই সমুদ্র স্রোত উষ্ণ। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আরও শীতল হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এই উষ্ণ সমুদ্র স্রোত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে প্রদক্ষিণ করে উত্তর আটলানটিকে চলে গেছে যার ফলে পার্শ্ববর্তী দেশ যথা নরওয়ে সুইডেন অপেক্ষা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ অনেক উষ্ণ আর এই উষ্ণতার জন্যেই বুঝি লণ্ডনে এমন ঘন কুয়াসার সৃষ্টি হয়।

আটলানটিস যতদিন সমুদ্রের বুকে জেগে ছিল ততদিন গালফ স্ট্রিমের অস্তিত্ব ছিল না। আটলানটিস জলে ডুবে যাবার পর এই স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রফেসর হ্যানস পেটারসন একজন বিখ্যাত সমুদ্র-বিজ্ঞানী। তিনি আটলান-টিকের এই অঞ্চলে দুবার অভিযান চালিয়েছেন। তিনি বলেন আটলান-টিসের অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমুদ্রতল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে পৃথিবীতে যখন পেলিওলিথিক মানুষ বাস করছিল তখন অর্থাৎ দশ থেকে বিশ হাজার বছর আগে এখানে বিরাট এক বিপর্যয় ঘটেছিল।

অনেক যুক্তি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ভূতাত্ত্বিক আটলানটিসের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেন নি, কিছু দ্বিধা আছে। পৃথিবীতে একদা গণ্ডোয়ানা ও লেমুরিয়া নামে দুটি দেশ ছিল যদিও গণ্ডোয়ানা সি বা লেমুরিয়া ওসেন নামে কোনো সমুদ্র ছিল না যেমন আছে আটলানটিক সি। গণ্ডোয়ানা নাম আজও চালু আছে। গণ্ডোয়ানা স্তরের কয়লার অনেকে নাম করেন। মধ্যপ্রদেশে গণ্ডোয়ানা নামে একটি গণ্ড গ্রামও অদ্যাপি আছে।

ভূতাত্ত্বিকদের আপত্তিটা অন্যত্র। তাঁরা বলেন পৃথিবীতে অনেক দেশ কালক্রমে যেমন লোপ পেয়েছে তেমনি অনেক দেশ বা দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলে আটলানটিসের মতো একটা বিরাট দেশ যা নাকি অন্ততঃ ৭৭,০০০ বর্গমাইল অর্থাৎ ২০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার একটা দেশ রাতা-রাতি জলের তলায় ডুবে যাবে এটা তাঁরা মেনে নিতে পারছেন না।

পৃথিবীতে দেশ ভাঙচুরের অনেক উদাহরণ আছে। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে ক্রাকাটোয়া দ্বীপটাই ফেটে দুভাগ হয়ে গেল, হঠাৎ মাটি ফেটে নতুন আগ্নেয়গিরি মাউন্ট পেলি সৃষ্টি হলো, এমন ঘটনা বিরল নয় এবং প্রতিক্রিয়া ছিল সীমাবদ্ধ তাই বলে একটা দেশ যার বিস্তৃতি আটলানটিকের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটা সেতুর মতো সেই দেশটা উল্কাপাতের ফলে এক দিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এটা ভূতাত্ত্বিকদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু আর একদল সমুদ্র-বিজ্ঞানী বলেন দেশ যে একটা ছিল তার তো অনেক নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে এবং এরকম একটা ঘটনা পৃথিবীতে মাত্র একবার ঘটাও কি অসম্ভব? যা ঘটেছে আটলানটিসের ক্ষেত্রে।

একদল ভূতাত্ত্বিক বলেন যে দেশগুলি আগাগোড়া একটি বা একই রকম মৃত্তিকা বা পাথর দিয়ে তৈরি নয়। বিভিন্ন স্তর আছে এবং সর্বনিম্ন স্তর বেশ কোমল যে জন্যে দেশগুলি খুবই ধীরগতিতে স্থানচ্যুত হতে পারে এবং হয়। মানচিত্রের দিকে ভালো করে দেখলেই বোঝা যাবে যে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা একদা যুক্ত ছিল, দাক্ষিণাত্যও বোধহয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। গ্রীনল্যাণ্ড একদা ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিন্তু দেশগুলি ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং অন্তর্বর্তী সমুদ্র প্রশস্ত হয়েছে।

হ্বেগনার বলেন একদা পুরনো পৃথিবী ও নতুন পৃথিবীর অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে কোনো সমুদ্র ছিল না। মাঝে মাঝে হ্রদ ছিল, সেই হ্রদগুলিই মহাসাগরে পরিণত হয়েছে। হ্বেগনারের এই তত্ত্ব "কন্টিনেণ্টাল ড্রিফট" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

আটলানটিসের যে উন্নত সভ্যতার বর্ণনা প্লেটো দিয়েছেন সেটাও অনেক পুরাতত্ত্ববিদ মেনে নিতে পারছেন না। সভ্যতার উন্মেষ যবে থেকে হয়েছে বলে জানা আছে ও প্রমাণ আছে, আটলানটিসের সভ্যতা তার চেয়ে অন্ততঃ আর পাঁচ সাত হাজার বছর পুরনো এবং সেই সভ্যতা আটলানটিস নামে একটি দেশেই আবদ্ধ রইল?

বিরাট বিরাট প্রাসাদ, চোখ-ধাঁধানো মন্দির, অপূর্ব ভাস্কর্য, নানারকম ধাতু ও হাতির দাঁতের সুন্দর কারুকার্য, জ্যামিতিক বৃত্তাকারে খাল, চমৎকার সেচব্যবস্থা, শাসন প্রণালী এবং যে জনসংখ্যার আভাস প্লেটো দিয়েছেন তা মেনে নেওয়া যায় না। অনেক পুরাতাত্ত্বিক তা মেনে নেন নি।

আটলানটিসের সৈন্যবাহিনীর প্লেটো একটা হিসেব দিয়েছেন যথা ৪৮০০০০ পদাতিক সৈন্য, ১২০০০০ অশ্বারোহী, বড় চ্যারিয়ট বাহিনীতে নিযুক্ত ছিল ১৬০০০০ এবং চ্যারিয়টের সংখ্যা ছিল ১০০০০, হালকা চ্যারিয়ট ছিল ৬০০০০ এবং নাবিকের সংখ্যা ছিল ২৪০০০০। তাহলে সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত ছিল মোটামুটি দশ লক্ষ মানুষ। তাহলে দেশের মোট জনসংখ্যা

ছিল কত ?

অপর পক্ষ বলেন অবিশ্বাস করার কারণ নেই। কারণ আটলানটিসের দক্ষিণ দিকের উর্বর ভূমি ছিল সাতাত্তর হাজার বর্গমাইল। ফসল ভালো হতো, পশুপালন ছিল, জনসাধারণ ছিল পরিশ্রমী, জীবন ছিল সুখ ও আনন্দের অতএব ঐ বিশাল দেশে চার পাঁচ কোটি মানুষ থাকা অসম্ভব নয়। আর আটলানটিস সভ্যতার কোনো প্রমাণ কি পাওয়া যাচ্ছে না ? যেটুকু পাওয়া গেছে সেটুকু ভিত্তি করে গবেষণা চালাতে থাকলে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে।

ভারত, ব্যাবিলন, ইজিপ্ট, ইনকা ও অস্তেক প্রভৃতি প্রাচীন দেশ যারা ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল এবং দেশে ধাতুও পাওয়া যেত নানারকম ও প্রচুর পরিমাণে তাদের প্রাসাদে, মন্দিরে বা সমাধিতে ধাতুর যে নিখুঁত কারুকার্য দেখা যায় তা কি আমাদের তাক লাগিয়ে দেয় না ? তথাপি আটলানটিসের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

ইউরোপে রেনেসাঁর সময় বলা হতো যে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছে গ্রীস ও রোম। প্রাচীনকালে অত উন্নত সভ্যতা আর কোনো দেশের ছিল না, ওরা নাকি সভ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

তারপর একে একে অন্য দেশের প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কৃত হতে থাকল যার কাছে গ্রীক ও রোমের সভ্যতা নাবালক। ইজিপ্টে টুটানখামেনের কবরে রত্নভাণ্ডার দেখে জগৎ স্তম্ভিত। ভারত, চীন, মেসোপটেমিয়া, ক্রিট, এসব দেশের সভ্যতা ইউরোপের সভ্যতার চেয়ে অনেক পুরনো। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ইজিপ্টে যত বেশি পরিমাণে ও নিখুঁত অবস্থায় পাওয়া গেছে এমন আর কোথাও পাওয়া যায় নি।

আরও কয়েকটি দেশে প্রাচীন সভ্যতার এমন সব নিদর্শন পাওয়া যেতে থাকল যা অবশ্য মিশর, ভারত, চীন বা মেসোপটেমিয়া ইত্যাদি দেশের সভ্যতার সঙ্গে খাপ খায় না তবুও সেই দেশগুলি নিশ্চয় সভ্য হয়েছিল।

আমেরিকার মিসিসিপি উপত্যকায় বিরাটকায় জীবজন্তুর মূর্তি দেখা যায়। এক একটি মূর্তি ছোটখাটো একটি পাহাড়। হরিণ, বাইসন, নেকড়ে বাঘ বা অন্য জন্তুর মূর্তি তৈরি বা পাহাড় কেটে তৈরি করতে দক্ষতার প্রয়োজন। সেই প্রাচীন সভ্যতা নিশ্চয় সে দক্ষতা অর্জন করেছিল। সেই সব কীর্তি যে কত পুরাতন তা নির্ধারণ করতে আজও কেউ মাথা ঘামায় নি।

টিটিকাকা হ্রদের তীরে রহস্যময় কাঠামোগুলি কারা তৈরি করল আর কাঠ ও হাড়ের কারুকার্যের নিদর্শন নোভায়া জেমলিয়া অঞ্চলে কারা সৃষ্টি করল?

দক্ষিণ আমেরিকায় ম্যাট্টো গ্রসো ও টলটেক অরণ্যে কিংবা আমাজনের গভীর জঙ্গলে কি লুকিয়ে আছে কে জানে অথচ সেখানে যে কিছু আছে তা মানুষ বিশ্বাস করে। এইসব সভ্যতা অন্য দেশ থেকে এসেছিল কি? নাকি ওরা নিজেরাই সভ্য হয়েছিল।

আদি মানুষের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল চীন, জাভা ও আফ্রিকায় তবে চীনের মানুষটি সব চেয়ে পুরনো যদিও আজকের মানুষের সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্যই পাওয়া যাবে না।

এক এক যুগের মানুষের এক এক রকম নাম দেওয়া হয়েছে। একেবারে প্রাচীনতম মানুষগুলির নাম বাদ দিলুম। আধুনিক মানুষের সঙ্গে সর্বপ্রথম যাদের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় তারা হলো নিয়ানডারথাল মানুষ, তারা গুহায় বাস করত, বেঁটেখাটো। মজবুত গড়ন, কালো, হাত দুটো ছিল লম্বা।

তারপর এলো ক্রো-ম্যাগনন মানুষ। তারা অনেক সভ্য। খ্রীষ্টপূর্ব কুড়ি হাজার থেকে দশ হাজার বছর পর্যন্ত তারা পৃথিবীর বুকে বাস করেছে তারপর তো আধুনিক মানুষের যুগ এসে গেছে।

বলা হয়, ক্রো-ম্যাগননদের প্রথম আবির্ভাব রাশিয়া ও এশিয়ার মাঝামাঝি অঞ্চলে। তারা পাথর ঘষে ঘষে অস্ত্র তৈরি করত, শিকার করত, চামড়ার পোশাক পরত হয়তো কিন্তু তাদের একটা গুন ছিল। তারা ছবি আঁকতে পারত। গুহার গায়ে তারা অনেক সুন্দর ছবি এঁকেছে। ফ্রান্স ও স্পেনের

গুহায় এইসব ছবি দেখা যায়। ফ্রান্স ও স্পেনে নদীর মোহানায় এদের কংকালও পাওয়া গেছে এবং যে সব জন্তুর ছবি ওরা পাহাড়ের গুহায় এঁকেছে সে সব জন্তু ঐ সময় ইউরোপে পাওয়া যেত।

দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে দক্ষিণে টিয়েরা ডেল ফিউগো দ্বীপে ১৯৫৯-৬০ সালে ক্রো-ম্যাগনন মানুষের কংকাল পাওয়া গেছে। এরা তাহলে সমুদ্র পার হয়ে ওদেশেও গিয়েছিল।

কিন্তু একদল নৃতত্ত্ববিদ বলেন যে ইউরোপ থেকে কি ক্রো-ম্যাগনন মানুষ আমেরিকায় গিয়েছিল নাকি আমেরিকা থেকেই ক্রো-ম্যাগননরা ইউরোপে এসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ?

উত্তর আমেরিকার আদিবাসী যাদের আমরা রেড ইণ্ডিয়ান বলি, তাদের সঙ্গে ক্রো-ম্যাগনন মানুষের সাদৃশ্য আছে। ক্রো-ম্যাগননদের মতো রেড ইণ্ডিয়ানরা লম্বা, চওড়া হাড়, পেশীবহুল মজবুত হাড়, দৌড়ঝাঁপে ওস্তাদ, গতি ক্ষিপ্র।

এই ক্রো-ম্যাগননরা আমেরিকা থেকে সমুদ্র পার হয়ে ইউরোপে আসে। স্পেন ও ফ্রান্সের নদীমুখ দিয়ে তারা দেশের ভেতরে প্রবেশ করে। ইউরোপে তখন নিয়ানডারথাল মানুষরা বাস করত। তারা ছিল কম সভ্য। ক্রো-ম্যাগননরা তাদের আলপস পাহাড়ের দিকে খেদিয়ে দেয়।

ইউরোপে অনেক জায়গায় মাটি খুঁড়ে যে সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে জানা যাচ্ছে যে ক্রো-ম্যাগননরা পশ্চিম থেকে ইউরোপে প্রবেশ করেছে। এমনও অনুমান করা হচ্ছে যে ওরা আমেরিকা নয়, আটলানটিস থেকে এসেছিল। ওরা হলো আদি আটলানটিয়ান এবং ওদের মধ্যে কিছু আটলান-টিয়ান পশ্চিমে আমেরিকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল যারা পরে রেড ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত হয়েছে।

সমুদ্রের তলদেশ অনেক রহস্যের সমাধান করেছে তথাপি এখনও অনেক রহস্য জানতে বাকি আছে যথা আটলানটিস রহস্য। এমন একটা সভ্যতা যা দশ বারো হাজার বছর আগে জলের নিচে তলিয়ে গেছে সেই সভ্যতার দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী বা শিল্পকর্মের নিদর্শন অন্ততঃ দশ হাজার

ফুট গভীর জল থেকে উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব।

কারণ এই বারো হাজার বছরে সামগ্রীগুলি শুধু জলের তলায় ডুবে নেই, তার ওপর অনেক মাটির স্তরও জমা পড়েছে। ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের তলদেশও ওলট-পালট হয়েছে।

সমুদ্রের তলদেশ যদি ড্রেজার নামিয়ে খোঁড়া যায় এবং নদীর ওপর সেতু নির্মাণের সময় যেমন বিরাট চোঙা নামিয়ে জল ছেঁচে বার করে ফেলা হয়, সেই রকম কিছু করতে পারলে হয়তো কিছু আবিষ্কার করা যেত।

প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আটলানটিক সমুদ্রের কোন্ অংশে এই কাজ চালানো হবে? অবশ্য যদি বিরাট ও গভীর সমুদ্রে এমন কাজ করা সম্ভব হয়।

সোনা, রুপো বা অরিচাল্ক নির্মিত কোনো সামগ্রা পাওয়া যায় নি তবে সেরকম গভীরভাবে এখনও পর্যন্ত খোঁজ করাও হয় নি। একটি মাত্র নিদর্শন পাওয়া গেছে। অ্যাজোরস দ্বীপ অন্তর্ভুক্ত একটি দ্বীপে দক্ষিণ-পশ্চিমে খুব প্রাচীন একখণ্ড সরু তামার শেকল পাওয়া গেছে।

"আটলানটিস অ্যাণ্ড আটলানটিক" বইয়ের লেখক পিটারসন অনুমান করেন যে, এই শেকলের বয়স আটলানটিসের সমান। আর একটি নিদর্শন হলো ডঃ পল স্লিম্যান বর্ণিত ব্রোঞ্জের সেই পাত্রটি। তবে এই পাত্র সম্বন্ধে সকল পণ্ডিত একমত নন।

একদল বলছেন আটলানটিসের মানুষরা ল্যাটিন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, অতএব তাদের কাছে আটলানটিসে নির্মিত কোনো সামগ্রা তো থাকতেই পারে কিন্তু আর একদল তা মেনে নিতে পারছেন না। তাদেরও অবশ্য যুক্তি আছে।

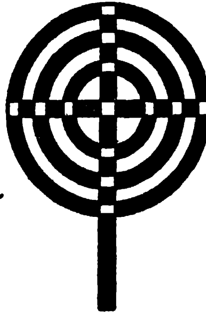
কলম্বাস তাঁর প্রথম সমুদ্রযাত্রায় গুয়ানাহানি দ্বীপে অবতরণ করে যে মানুষদের দেখেছিলেন তারা উলঙ্গ অসভ্য নরখাদকের দল ছিল না। তারা সভ্যই ছিল যদিও কলম্বাস তাদের 'জেণ্টল স্যাভেজ' বলেছেন।

তারপর কর্টেস ও তার সঙ্গীরা টোটোম্যাক এবং আনাহুয়াকদের ঐশ্বর্য দেখে স্তম্ভিত। তখনকার স্পেন পর্তুগাল বেশি সভ্য ছিল না এই অঞ্চলের মানুষেরা বেশি সভ্য ছিল? কর্টেস ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা বেপরোয়া লুটপাট ও

ধ্বংসকার্য যদি না চালাতো তাহলে হয়তো আটলানটিস সভ্যতার নিদর্শন ওখানেও পাওয়া যেত অন্ততঃ কিছু প্রমাণ পাওয়া যেত যে এমন একটা সভ্যতা একদা ছিল। অতএব বলতে হয় রেড ইণ্ডিয়ানরা বর্বর ছিল না, বর্বর ছিল ইউরোপের ঐ হানাদারেরা।

এদিকে ভারতে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জেও অতি উন্নত সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল। সাদা মানুষরা তখন কোথায়? অতি প্রাচীনকালে মানুষ যেখানে উর্বরা জমি ও খাদ্যের সন্ধান পেয়েছে সেখানে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে বিশেষ করে চীন, ভারত, মিশর, আরব ও অন্যান্য দেশের নদী উপত্যকায়।

উত্তর মেরু থেকে তুষারের ঢল নেমে এসে ইউরোপকে যখন ঢেকে ফেলেছিল আটলানটিসের আবহাওয়া তখন ছিল ভিন্ন রকম, সভ্যতা গড়ে ওঠার পক্ষে বিশেষ অনুকূল।



আটলানটিস নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে মানুষ থামবে না বলে মনে হয়। বিখ্যাত এভারেস্ট অভিযাত্রী ম্যালরিকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন : এভারেস্টের চূড়োয় ওঠবার দরকারটা কি?

উত্তরে ম্যালরি বলেছিলেন : বিকজ ইট ইজ দেয়ার, ওটা যখন আছে এবং ওর মাথায় কি আছে না দেখে আমরা ছাড়ছি না।

আটলানটিসের ব্যাপারও ঠিক তাই। এই রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মানুষ থামবে বলে মনে হয় না।

আটলানটিস রহস্য সমাধানে সোভিয়েট রাশিয়া উঠে-পড়ে লেগেছে। সোভিয়েট রাশিয়া কি করে না করে সে বিষয়ে বাইরের জগৎ বিশেষ কিছু জানতে পারে না এইজন্যে উইনস্টন চার্চিল রাশিয়াকে বলতেন আয়রণ কারটেন, লৌহ যবনিকা।

তা সেই সোভিয়েট রাশিয়ার হাতে এমন একটা তথ্য দৈবক্রমে এসে গেছে যে মনে হয় পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে আটলানটিসের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলবে।

সকলের জানা আছে যে ১৯৫৫ সালে সাতচল্লিশ বৎসর বয়স্ক ভূতাত্ত্বিক ডঃ ভিভিয়ান ফুকস্-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ মেরুতে এক বিরাট অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। সেই অভিযাত্রী দলে এভারেস্ট বিজয়ী এডমণ্ড হিলারিও ছিলেন।

অভিযাত্রী দলের উদ্দেশ্য ছিল আনটারটিক অতিক্রম করা। দেশটা নেহাত ছোট নয়, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া একত্র করলে যত বড় হবে তত বড়। প্রচণ্ড শীত তো বটেই এছাড়া দেশটার প্রকৃতি অত্যন্ত রুক্ষ।

কোথাও কোথাও শ্যাওলা ছাড়া আর কোনো উদ্ভিদের চিহ্ন নেই। পশুর মধ্যে আছে সীল, কিছু সী-বার্ড এবং পেঙ্গুইন। তাও সর্বত্র নয়। সমুদ্রের সীমানায় কোনো কোনো জায়গায় পাওয়া যায়।

মাটি বলতে কিছু আছে হয়তো কিন্তু ওপরটা চিরতুষারে আবৃত, কোথাও হাজার ফুট গভীর এবং সে তুষার বিশ্বাসঘাতক অনেক জায়গায়। তার প্রকৃতি কোমল না কঠোর ওপর থেকে তা ধরা যায় না। এসবের ওপর আছে তীব্র তুষারঝঞ্ঝা।

যাই হোক মোট ৯৯ দিনে অভিযাত্রীদল ২১৫৮ মাইল অর্থাৎ আনটারটিকার এক দিক থেকে আর এক দিক অতিক্রম করেছিলেন।

১৯৫৮ সালের ২ মার্চ তারিখে ওদের অভিযান শেষ হয়েছিল।

এর প্রায় দশ বছর পরে একটি সোভিয়েট অভিযাত্রী দল দক্ষিণ মেরুতে প্রেরিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। কয়েক প্রকার বিরল ধাতু আনটারটিকায় পাওয়া যায় বলে ভূতাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন যেগুলি ল্যাবরেটরিতে

অনেক রহস্যের সমাধান করতে পারে।

উত্তর মেরুতে ঐসব ধাতু পাওয়া যায় নি, সাইবেরিয়াতেও পাওয়া যায় নি, তাই এই দক্ষিণ মেরু অভিযান।

বরফে চলবার উপযোগী ট্র্যাকটর এবং নানারকম সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ নিয়ে জাহাজ এসে পৌঁছল ওয়েডেল সি-এর তীরে। এখান থেকেই যাত্রা শুরু হবে।

এখানে ওরা একটা বেস ক্যাম্প স্থাপন করল। সেখান থেকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন দিকে সন্ধানী দল পাঠান হতো। তারা নমুনা সংগ্রহ করে আনত। সেই নমুনা বেস ক্যাম্পে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা হতো।

অভিযাত্রী দল খুব বড় ছিল না, স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও বিরাট ছিল না। তারা স্নো-ট্র্যাকটরে চেপে কয়েক মাইল যেত তারপর বরফ খুঁড়ে সম্ভাব্য কোনো আকর পাওয়া গেলে নমুনা সংগ্রহ করে ফিরে আসত। এইভাবে কাজ চলছিল এবং এক মাস কেটে গেল।

একদিন একটা কাণ্ড ঘটল। এই জায়গাটায় ওরা আগে কোনোদিন আসে নি। এখানে বরফ কিছু নরম, ওরা আগে বরফের গভীরতা পরীক্ষা করে সাবধানে পা ফেলে চলছিল।

ওরা দেখল এক জায়গায় অনেকগুলো পেঙ্গুইন জড়ো হয়ে যেন বোর্ডমিটিং করছে, তাদের ভাবভঙ্গি দেখে তাই মনে হলো। একটা স্নো-ট্র্যাকটর চালিয়ে চার পাঁচজন মানুষ এলো, অদ্ভুত তাদের পোশাক। পেঙ্গুইনগুলোর তো পালিয়ে যাবার কথা কিন্তু তাদের নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না।

কিন্তু অতগুলো প্রায় পনেরো ষোলোটা পেঙ্গুইন কি মিটিং করছে ? ওরা তো মানুষ দেখলে পালিয়ে না গেলেও সরে যায় কিন্তু এই পেঙ্গুইনগুলোর সরে যাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

সত্যিই ওরা যেন মিটিং করছে, নিজেদের ভাষায় কি সব বলাবলি করছে, মাঝে মাঝে মানুষদের মুখের দিকে চেয়ে দেখছে। কি ব্যাপার ?

নমুনা সংগ্রহকারী রুশ দল ট্র্যাকটর চালিয়ে যখন পেঙ্গুইন দলের কাছে থামল তখন পেঙ্গুইনগুলো যেন অনিচ্ছায় স্থান ত্যাগ করল। নমুনা সংগ্রহকারী-

দের সন্দেহ হলো এখানে বরফের ওপরে বা ভেতরে কিছু আছে।
ওরা ট্র্যাকটর থেকে নেমে পড়ে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে চলল। যেখানে পেঙ্গুইনগুলো জড়ো হয়েছিল সেখানে ওরা কিছু দেখতে পেল না। শুধু লক্ষ্য করল জায়গাটা কিছু নিচু, অগভীর বড় একটা গর্ত।
দলের একজন বলল এই জায়গাটায় কিছু থাকতে পারে। সকলে তার মত সমর্থন করল। ওদিকে পেঙ্গুইনগুলো অদূরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে মানুষ-গুলোর ক্রিয়াকলাপ সকৌতুকে লক্ষ্য করতে লাগল।
অতএব স্থির হলো যে জায়গাটা খুঁড়ে দেখা হোক। বরফ এখানে নরম। খুঁড়তেও হবে না, বেলচা দিয়ে আস্তে আস্তে তুলে ফেললেই চলবে। ওরা তাই আরম্ভ করল। বেশি বরফ তুলতে হলো না। দু ফুট আন্দাজ খুঁড়তে মনে হলো নিচে যেন কি রয়েছে। অতএব সাবধানে ওরা বরফ তুলতে লাগল।
একজন বলল, মনে হচ্ছে কোনো মানুষ বরফে প্রোথিত হয়ে রয়েছে অত-এব খুব সাবধান, যদি মানুষ হয় তাহলে দেখো যেন দেহে আঘাত না লাগে। মানুষ হলে বেঁচে নেই নিশ্চয় তবুও বেলচার আঘাত লেগে শরীরে যেন ক্রটি না হয়ে যায়!
অনুমান ঠিক। হাঁটু মোড়া অবস্থায় একটা পুরো মানুষ বরফে প্রোথিত হয়ে রয়েছে। ওরা সাবধানে মানুষটিকে বরফ-বন্দী-দশা থেকে মুক্ত করে ওপরে তুলল।
কিন্তু এ কোথাকার মানুষ! কতদিন বরফের মধ্যে আটকে আছে? দেহ তো একেবারে লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এ কোন্ দেশের লোক, দেহে যেটি লেপটে রয়েছে সেটি তার পোশাক হলেও এখন আর চেনা যাচ্ছে না সেই পোশাকের চেহারা কেমন ছিল। মাথার চুল আর চুল বলে চেনা যায় না। কোন্ দেশের লোক? এখানে কি করে এলো? কতদিন এখানে আছে?
ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল। একজন বলল, লাশটাকে জাহাজে নিয়ে যাই, যা করবার ওরা তাই করবে। আর একজন বলল,

আমার তো মনে হয় এই মানুষটার মধ্যে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে ; জানা দরকার কোন্ দেশের লোক, কতদিন এখানে প্রোথিত হয়ে রয়েছে কারণ লোকটির পোশাক যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যে লোকটি দক্ষিণ মেরু অভিযানে এসেছিল।

আর একজন বলল, লোকটির পায়ের জুতো দেখেছ ? এমন জুতো তো আমি আমার জীবনে দেখি নি, লোকটা প্লেন থেকে পড়ে যায় নি তো ?

লাশটা আমার এত পুরনো মনে হচ্ছে যে তখন বোধহয় প্লেন আবিষ্কৃত হয় নি।

বলো কি হে ? এত পুরনো ? হতে পারে। লোকটা কি রকম লম্বা দেখেছ ? ছ ফুট তিন চার ইঞ্চি হবে বোধহয় আর গায়ের রঙ যেন লালচে ব্রাউন। লাশটা মসকোয় নিয়ে যাওয়া উচিত।

একজন ওয়াকি-টকি বার করে জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে খবর দিলো। বরফের নিচে প্রোথিত অদ্ভুত একটা মানুষ পাওয়া গেছে। মানুষটাকে মসকোয় নিয়ে যাওয়া উচিত, জাহাজের কোল্ড স্টোরেজে জায়গা করে রাখ।

জাহাজে খবর দিয়ে ওরা প্রায় ফসিল হয়ে যাওয়া মানুষটাকে খুব সাবধানে ট্র্যাকটরে তুলল। ওরা নজর রাখল কোনো কিছু যেন নষ্ট না হয়। ওদের মনে হলো লোকটির পোশাকের সঙ্গে আরও কিছু লেপ্টে রয়েছে। সেগুলি কি ? দেখে মনে হয় মোটা কাগজ কিন্তু কাগজ নয়। ওরা প্যাপিরাস দেখে নি। প্যাপিরাস দেখে থাকলে চিনতে পারত যদিও বিশেষজ্ঞ ছাড়া ওগুলিকে আজ আর প্যাপিরাস বলে চিনতে পারবে না।

জাহাজ থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কার ডেডবডি ? ওখানেই থাক না, আমরা বরঞ্চ ওখানে গিয়ে ওর কবর দেবার ব্যবস্থা করব। জাহাজ থেকে একটা ক্রুশ বানিয়ে নিয়ে যাব।

এরা বলল, ডেডবডিটা খুব পুরনো মনে হচ্ছে, চেহারা ও ছেঁড়া পোশাক ও পায়ের জুতো দেখে চেনাই যাচ্ছে না কোন্ দেশের লোক। তাছাড়া ডেডবডিটা ভীষণ শক্ত হয়ে গেছে, ফসিল বললেই হয়, দুশো চারশো বছর

পুরনো হলেও আমরা অবাক হব না।

বল কি ? তাহলে তো মসকোয় অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সে নিয়ে যেতে হয়, তা তোমাদের ট্র্যাকটরে জায়গা হবে ? নাকি আর একটা ট্র্যাকটর পাঠাবো ?

পাঠালে ভালো হয়, তাহলে আমাদের আর হেঁটে যেতে হয় না।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে আর একটা স্নো-ট্রাকটর এলো। সযত্নে দেহ আবৃত করে ওরা ট্র্যাকটরে তুলে নিয়ে চলল। জাহাজের কোল্ড স্টোরেজেও ওরা ডেড-বডিটা খুবই যত্ন সহকারে রাখল। জাহাজে যে বিজ্ঞানীরা ছিলেন তাঁরাও কিছু স্থির করতে পারলেন না।

এই রাশিয়ান অভিযাত্রী দলের নিউজিল্যাণ্ডে একটা ছোট আস্তানা ছিল। এখান থেকে মসকো হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো।

জাহাজের বিজ্ঞানীরা নিউজিল্যাণ্ড মারফত মসকোতে একটা বার্তা পাঠাল। বার্তায় লিখল যে সাউথ পোলে একটা খুব পুরনো ডেডবডি পেয়েছে কিন্তু মানুষটা কোন্ দেশের এবং কত পুরানো তা কিছুই নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। আমাদের মনে হচ্ছে এই মৃতদেহের সঙ্গে প্রাচীন কোনো সভ্যতার যোগাযোগ থাকতে পারে। আমরা আমাদের জাহাজের কোল্ড স্টোরেজে যতদূর সম্ভব সযত্নে বডিটা রেখেছি। আপনাদের নির্দেশের অপেক্ষায় রইলুম।

নিউজিল্যাণ্ড ঘাঁটি এই বার্তা বেতার মারফত মস্কো হেডকোয়ার্টারে জানাল।

এই বার্তার জবাব আসতে তিন দিন দেরি হলো। মসকো অভিযাত্রী জাহাজকে জানাল তোমরা বডি নিয়ে নিউজিল্যাণ্ডে এস। আমরা কোল্ড চেম্বার সমেত বিশেষ একটা জেট প্লেন পাঠাচ্ছি। সেই প্লেনের পাইলটকে বডি ডেলিভারি দেবে কিন্তু পাইলট জাহাজে না পৌছানো পর্যন্ত কোল্ড স্টোরেজ থেকে বডি বার করবে না। পাইলটকে বডি ডেলিভারি দিয়ে তোমরা আবার সাউথ পোলে ফিরে যাবে। প্রোগ্রাম অনুসারে নির্ধারিত

তারিখ পর্যন্ত কাজ করবে তবে লক্ষ্য রাখবে ওরকম আর কিছু পাও কি না। সব কিছু গোপন রাখবে।

ওয়েডেল সি এলাকা থেকে নিউজিল্যাণ্ডের ক্রাইস্টচার্চ বন্দরে জাহাজ পৌঁছতে আট দিন লাগল। ওদিকে ভ্লাডিভস্টক থেকেও সেই দিনই জেট প্লেন এসে পৌঁছেছে।

অভিযাত্রী জাহাজের বিজ্ঞানীরা মসকোর নির্দেশ অনুসারে সেই প্রাচীন মৃতদেহটি পাইলটকে ডেলিভারি দিলো। পাইলটের মুখ যেন সেলাই করা। সে এদের সঙ্গে কোনো কথা বলল না। বডি ডেলিভারি নিয়ে সই করে দিলো।

এরা জিজ্ঞাসা করেছিল বডি কোথায় নিয়ে যাবে ? পাইলট উত্তর দেয় নি ; বলেছিল বলা নিষেধ আছে। তবে এইটুকু বলতে পারি আমি এখান থেকে ভ্লাডিভস্টক যাব, সেখান থেকে আসছি কিন্তু তারপর যেখানেই যাই মসকো বা লেলিনগ্রাড যাব না। তোমরা তোমাদের কাজে ফিরে যাও, আমিও ফিরে যাই।

সাউথ পোল থেকে মেসেজ পেয়ে মসকোর আরকিওলজিক্যাল অ্যাকা-ডেমি এই ব্যাপারে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। সাউথ পোলে একটা প্রাচীন সভ্যতা ছিল বা এখনও আছে, এরকম একটা কানাঘুষো শোনা যায়। রাশিয়ান অভিযাত্রী দল যে বডিটা পেয়েছে সেটা যদি সেই সভ্য জগতের কোনো একটা মানুষের হয় তাহলে তো একটা বিরাট ব্যাপার হয় এবং সমস্ত কৃতিত্ব রাশিয়া একাই দাবি করবে।

এই ডেডবডি থেকে আশাব্যঞ্জক কিছু পাওয়া গেলে সাউথ পোলে যে জায়গায় বডিটা পাওয়া গেছে সেই অঞ্চলটাই ওরা খুঁড়ে দেখবে। সেই বডি নিয়ে গবেষণা মসকোতে চালানো হবে না। সাইবেরিয়ায় টোমস্ক আরকিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের একটা শাখা আছে।

ভ্লাডিভস্টক থেকে ডেডবডিটা টোমস্কে নিয়ে যাওয়া হবে। ইতিমধ্যে টোমস্ক অ্যাকাডেমিতে সব রকম ব্যবস্থা করে রাখা হলো। কয়েকজন বিশিষ্ট

বিজ্ঞানী ও প্রাচীন বিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেন এমন দু'জন পণ্ডিতকেও পাঠান হলো। এঁদের মধ্যে আনাতোলি ইগেরভের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন সভ্যতা বিষয়ে তাঁর তুল্য পণ্ডিত রাশিয়াতে আর নেই।

ভ্লাডিভস্টকেও আগাম দু'জন বিজ্ঞানী পাঠানো হয়েছে। ভ্লাডিভস্টক থেকে সোভিয়েট ইয়াক-ফর্টি বিমানে বডি তুলে নিয়ে ওরা টোমস্ক ইনস্টিটিউটে নিয়ে এলো।

যে দু'জন বিজ্ঞানী ভ্লাডিভস্টকে আগাম গিয়েছিল তাঁরা তো বডি দেখে স্তম্ভিত। তাঁরা কিছুই স্থির করতে পারলেন না। হ্যাঁ, বডিটা খুবই পুরনো। কত পুরনো? এতো প্রায় ফসিল হয়ে গেছে। মানুষটা বেঁচে থাকলে হাজার বছর বয়স নিশ্চয় হতো।

মস্কো ও টোমস্কে ওরা দু'জন প্রাথমিক রিপোর্ট নিয়ে টোমস্ক চলে এলেন। টোমস্ক ইনস্টিটিউটে এই ডেডবডি নিয়ে পুরো গবেষণার ভার দেওয়া হয়েছিল আনাতোলি ইগেরভের ওপর। তিনিই সব কিছু পরিচালনা করবেন, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী বা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আর সকলে কাজ করবেন।

প্রথমে স্থির হলো ডেডবডির বয়স নির্ধারণ করা হোক। অতএব কার্বন টেস্ট করা হলো। পরীক্ষা করে বিজ্ঞানী রায় দিলেন এই বডি অন্ততঃ বারো হাজার বছর পুরনো!

বারো হাজার? কি বলছ? আবার পরীক্ষা কর। আবার কেন? পর পর কয়েক বার পরীক্ষা করা হলো। যতবার পরীক্ষা এবং যত ভাবে পরীক্ষা করা হলো ফল সেই এক। ডেডবডির বয়স বারো হাজার বছর। অবিশ্বাস্য।

কাজের সুবিধের জন্যে বিজ্ঞানীরা ডেডবডিটার একটা নাম দিলো'আইভান'। আইভানের বয়স যদি বারো হাজার বছর হয় তাহলে তো মানব সভ্যতা সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করতে হয়। মানব সভ্যতার বয়স পাঁচ হাজার বছর মাত্র। তাহলে?

দলে যে অ্যানথ্রোপোলজিস্ট বা নৃতত্ত্ববিদ ছিলেন তিনি বললেন লোকটি হলো ক্রো-ম্যাগনন, বয়সের সঙ্গে মিলেও যাচ্ছে, তখন পৃথিবীতে ক্রো-

ম্যাগনন মানবগোষ্ঠী বিচরণ করত। আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে চেহারার অনেক সাদৃশ্য আছে কিন্তু লোকটি রেড ইণ্ডিয়ান নয় কারণ রেড ইণ্ডিয়ান সভ্যতা অত প্রাচীন নয়।

আইভান চির-তুষারে প্রোথিত হয়ে ছিল বলে তার দেহ এখনও টিঁকে আছে, বিকৃত হয় নি। ওর দেহ থেকে পরিচ্ছদের অবশিষ্ট অংশ সতর্কতার সঙ্গে খুলে নেওয়া হলো।

এই সময় তার দেহ থেকে পাওয়া গেল সেই প্যাপিরাস পাতাগুলি। সেগুলি খুব সতর্কতার সঙ্গে বার করে সেগুলি সযত্নে পৃথক করা হলো তারপর সেগুলি যাতে মুক্ত বায়ুতে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্যে বিজ্ঞানীরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিলেন।

এত বেশি সাবধান হওয়ার কারণ এই যে সেই প্যাপিরাসগুলির ওপর খুব ছোট ছোট অক্ষর যেন দেখা যাচ্ছে। পাঠোদ্ধার করতে পারলে সবই জানা যাবে।

আইভানের বয়স বারো হাজার বছর শুনে টোমস্ক ইনস্টিটিউটের সকলে চমকে উঠলো। আনাতলি তো রীতিমতো উত্তেজিত। নিজের মনে বিড় বিড় করেন, বারো হাজার, বারো হাজার···কি করে হবে?....না না সে অসম্ভব···।

আনাতলির এমন উত্তেজিত অবস্থা দেখে তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে না। ইনস্টিটিউটে এলেনা পনোমায়িয়ভা নামে একটি মেয়ে বিজ্ঞানী ছিল। আনাতলি মেয়েটিকে নিজ কন্যার মতো ভালবাসতেন।

ইনস্টিটিউটের অন্যান্য কর্মীরা একদিন এলেনাকে আনাতলির ঘরে ঠেলে পাঠিয়ে দিলো: তুমি জিজ্ঞাসা কর এলেনা, প্রফেসর আনাতলি কি ভাবছেন, তিনি কি সন্দেহ করছেন?

এলেনা সাহস করে ঘরে ঢুকে দেখল প্রফেসর আনাতলি টেবিলে দুই কনুই রেখে দুই হাত দিয়ে মাথা ধরে ঝুঁকে বসে রয়েছেন। পাশে সেই প্যাপিরাস শিটগুলি সাজানো রয়েছে।

এলেনা যে ঘরে ঢুকল তা তিনি টের পান নি। পা টিপে টিপে এলেনা

সামনে গিয়ে দাঁড়ালো তারপর মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল :

প্রফেসর কফি আনতে বলব ?

মাথা তুলে বললেন : কে? এলেনা। কফি, তা হলে মন্দ হয় না। ততক্ষণ একটু মিউজিক শুনি, টেপরেকর্ডটা একটু চালিয়ে দাও তো।

এলেনা প্রথমে ইন্টারকমে কফি ও চিজ আনতে বলে রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে দিলো। প্রথমে বাজতে আরম্ভ করল ইণ্ডিয়ান মিউজিক। বোধহয় কেউ কোনো তারের যন্ত্র বাজাচ্ছে। এলেনা ঠিকই অনুমান করেছিল, সরোদ বাজছিল।

এলেনা অনুমান করল গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকলেও আনাতলির মেজাজ এখন ভালো আছে নইলে মিউজিক শুনতে চাইতেন না। তাহলে ও কফির সঙ্গে চিজ আনতে বলে ভালই করেছে। ব্ল্যাক কফির সঙ্গে আনাতলি কামড়ে কামড়ে চিজ খেতে খুব ভালবাসেন।

অবিলম্বে কফি এসে গেল। সঙ্গে চিজ দেখে আনাতলি খুশি হলেন, একটু মৃদু হাসলেনও। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি তো তাই হাসতে হাসতে বললেন : এলেনা মা তোমার কিছু মতলব আছে মনে হচ্ছে ? কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছ নাকি কিছু চাই ?

হ্যাঁ প্রফেসর, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছি এবং তার উত্তর চাই। আপনি আইভানের বিষয় কি অনুমান করছেন ?

এই তোমার প্রশ্ন? তাহলে শোনো। আইভান সম্বন্ধে আমি একটা অনুমান করেছি কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে সাহস করছি না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি প্যাপিরাসের লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারছি। কাছে এসে দেখ যেন খুব ছোট ছোট ছবি আঁকা রয়েছে। এটা প্যাপিরাস কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো আমি বহু রকম প্রাচীন লিপি দেখেছি, পাঁচ হাজার বছরের পুরনো মহেঞ্জোদড়ো লিপিও দেখেছি কিন্তু এমন পুরনো লিপি আমি দেখি নি।

আপনি বললেন আইভান সম্বন্ধে আপনি একটা অনুমান করেছেন কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌছতে সাহস করছেন না। তাহলে আইভান কোথাকার

মানুষ ?

প্রফেসর বললেন, মানব সভ্যতা কত প্রাচীন ?

কত আর ? পাঁচ হাজার বছর।

কিন্তু আমাদের ল্যাবরেটরি বলছে আইভানের বয়স বারো হাজার বছর, যদিও ক্রো-ম্যাগনন টাইপ তা হলেও আইভ্যানকে দেখে মনে হচ্ছে রীতিমতো সিভিলাইজড, সভ্য, তা তো ওর পোশাক ও পোশাকের তন্তু এবং পায়ের জুতো দেখে তো মনে হচ্ছে।

তাহলে প্রফেসর আপনি বলতে চান মানব সভ্যতা বারো হাজার বছর পুরনো! তার মানে আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে।

তা তো বটেই, তুমি আটলানটিসের নাম শুনেছ ?

হ্যাঁ শুনেছি, প্লেটো তার বর্ণনা করে গেছেন, তাহলে প্রফেসর আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে যে আইভান আটলানটিসের মানুষ ? কিন্তু আটলানটিস তো প্লেটোর কল্পনা হতেও পারে ?

না, কল্পনা নয়, বর্তমানে বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত আমার সমস্যা হলো এই লিপির পাঠোদ্ধার করা, জানি না কতদিন সময় লাগবে, পাঠোদ্ধার না করা পর্যন্ত আমি শান্তি পাচ্ছি না। পাঠোদ্ধার করে যদি প্রমাণ করতে পারি যে আইভান আটলানটিসের লোক তাহলে একটা কাজ হয়।

কাজ কি বলছেন প্রফেসর ? সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি হবে।

সে পরের কথা, আমাদের কিন্তু এখনি কাজে নামতে হবে, তুমি এক কাজ কর, এলেনা, সকলকে এই ঘরে ডাক, আমি বিষয়টা নিয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনা করি আর কফির ব্যবস্থা কর।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সকলেই প্রফেসর আনাতলির ঘরে এসে গেল। সকলে স্ব স্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কফি এলো। কফির জারে চুমুক দিতে দিতে প্রফেসর আনাতলি তাঁর সন্দেহের কথা বললেন। তিনি স্পষ্ট করেই বললেন আইভান আটলানটিসের মানুষ এবং সেটা প্রমাণ করতে হলে প্যাপিরাস বা যার ওপরই লেখা হয়ে থাকুক এই লিপির পাঠোদ্ধার

করতেই হবে। এরকম লিপি আমি আগে কখনোই দেখি নি।

কফির জার নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, এই লিপি পাঠোদ্ধার করতে কত সময় লাগবে তা আমরা বলতে পারি না কিন্তু আপনাদের কারও কথা কি মনে পড়ছে যিনি প্রাচীন লিপি পাঠোদ্ধারে দক্ষ, আমাদের দেশে যে নেই তা আমি জানি কিন্তু অন্য কোনো দেশে?

প্রফেসর উস্তিনভ বললেন, আমি একজন অসাধারণ মানুষকে জানি যে নিজেই এই আটলানটিসের মতো এক রহস্য, তাঁর নিজস্ব কোনো দেশ বলে কিছু আছে কিনা তাও জানি না এবং তার বয়স যে কত তাও আমি জানি না. কেউ বলে তিনি নাকি অন্য গ্রহের মানুষ. সে যাই হোক তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী কিন্তু তিনি বর্তমানে কোথায় আছেন আমি জানি না।

প্রফেসর আনাতলি অত্যন্ত কৌতূহলী হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর নাম কি আমি শুনি নি?

শুনে থাকতে পারেন তাঁর নাম কাউন্ট সেন্ট জার্মেন।

কাউন্ট সেন্ট জার্মেন অর্থাৎ কাউন্ট সিনজার্মেন, এ নাম শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না, আর কি বললে? মানুষটি আটলানটিসের মতোই মিস্টিরিয়স, তার বিষয় কি জান বলো তো? তার ঠিকানা জানা থাকলেও আমাদের কেজিবি-এর সাহায্যে খুঁজে বার করতে পারি।

তাহলে শুনুন প্রফেসর, ইংলণ্ডেব এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে তার বিষয় লেখা আছে যে কাউন্ট সেন্ট জার্মেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন প্রবাদ পুরুষ, ইউরোপে তিনি 'দি ওয়াণ্ডারম্যান' নামে পরিচিত। তিনি কোথায় জন্মেছেন এবং কোথায় মারা গেছেন তাও জানা যায় না। ভলটেয়ার যে নাকি সব বিষয়ে উন্নাসিক সেও ফ্রেডারিক দি গ্রেটের কাছে এই ওয়াণ্ডারম্যানের প্রশংসা করেছেন, বলেছেন, মানুষটি অমর এবং জানে না এমন বিষয় নেই।

একজন প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলেন, তবুও লোকটা ফ্রেঞ্চ না জার্মান? তাও কি জানা যায় না?

নানা পণ্ডিতের নানা মত। একজন বলেন সে পর্তুগালের কোনো রাজার অবৈধ সন্তান, আর কেউ বলে সে স্পেনের হাপসবার্গ বংশের এক বিধবা রাণী ও বোর্দোর একজন ধনী পর্তুগীজ ইহুদির সন্তান, ভিয়েনার একজন জানাশোনা লোক বলেন, ওসব বাজে কথা। সিনজার্মেন হলো প্রিন্স ফ্রানসিস লিওপোল্ড রাকোজি এবং প্রিন্স শার্লট আমেলির পুত্র ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে ওর জন্ম। যাই হোক অতি উচ্চ অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম। ইউরোপের সব রাজসভায় তার অবাধ ও স্বচ্ছন্দ গতি ছিল। ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুই তাঁকে খুব খাতির করতেন।

অনেকে বলে কাউন্টের বয়স দু' হাজার বছর কিন্তু কাউন্ট নিজে কিছু বলে না। আবার কেউ বলে কাউন্ট একটা এলিকসার পান করেন। ওঁর বয়স মেথুসেলার চেয়েও বেশি। একজন পণ্ডিত তো বলেছেন কাউন্ট স্বয়ং বাইবেলের মোজেস। মোজেসের কবর আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

কাউন্টের অসাধারণ গুণাবলীর পরিচয়, তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, কথা বলার অদ্ভুত ক্ষমতা এবং রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে জানা যায় সমসাময়িক ব্যক্তিদের ডায়েরি, চিঠিপত্র ও আত্মজীবনী থেকে।

কয়েকশত বৎসরের ইতিহাস তো কাউন্টের নখদর্পণে ছিল কারণ নানা ঘটনার তিনি ছিলেন স্বয়ং সাক্ষী।

পনটিয়াস পিলেট ও তদানিন্তন খ্রীশ্চানদের কাহিনীর তিনি নিখুঁত বর্ণনা দিতেন শুনে মনে হতো তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন, কোথাও কোনো ত্রুটি নেই।

ভলটেয়ারের মতো সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মানুষও লিখেছেন যে কাউন্টের সব কথা সত্য। প্রাচীন ট্রেন্ট শহরে কাউন্ট 'ফাদারস অফ দি কাউনসিল'-এর সভ্যদের সঙ্গে নৈশভোজের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে তিনি নিজে উপস্থিত না থাকলে এমন নিভুঁল বর্ণনা কারও পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

জার্মান দার্শনিক গ্রিম তো কাউন্টের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। তিনি বলেছেন কাউন্ট সিনজার্মেন 'সর্ববিদ্যাবিশারদ'। তাঁর তুল্য এত

রকম গুণের অধিকারী ও স্মৃতিধর কোনো ব্যক্তিকে তিনি জানেন না। কয়েক শত বছরের অতীত কাহিনী তিনি বলতে পারেন এমনভাবে যেন তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। কাউন্ট নিজে মেরি ট্যুডর এবং লা রাইন মারগটের বন্ধু ছিলেন। প্রথম ফ্রানসিস বা অষ্টম হেনরির সঙ্গে তাঁর অনেক কথাবার্তা হয়েছে। মাদাম দ্য পম্পাতুর কাউন্টের বিষয় নিজের স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন। কাউন্ট সব ভাষা জানতেন এমন কি কয়েকটি প্রাচীন ভাষাও উত্তমরূপে জানতেন।

ফ্রান্সের পঞ্চদশ লুইয়ের রাজসভায় তো বটেই পূর্ববর্তী কয়েকটি রাজ-সভাতে কাউন্টের আনাগোনা ছিল। কাউন্ট দাবি করেন যে তিনি আফ্রিকা, এশিয়া, রাশিয়া এবং টারকি অনেকবার গিয়েছেন এবং কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত।

ক্লিওপেট্রার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। শেবার রাণীকে বিয়ে করবার জন্যে তিনি সলোমনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে চেয়েছিলেন। কাউন্টের এক বন্ধু ফন গ্লাইসেন কাউন্টের এইসব উক্তি সমর্থন করেছেন।

কাউন্ট রীতিমতো ধনী। রাজসভায় যখন যেতেন তখন পোশাকের আড়ম্বর তো ছিলই উপরন্তু অনেক দুষ্প্রাপ্য ও দূর্মূল্য অলংকার পরতেন।

কাউন্ট অতি শুদ্ধভাবে ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনিশ, পর্তুগিজ ও ইটালিয়ান ভাষা বলতে পারতেন তবে তাঁর ফরাসি ভাষায় কিছু আঞ্চলিক টান ছিল। ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে কাউন্টকে রাজা দ্বিতীয় জেমসের গুপ্তচর বলে লণ্ডনে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

ঐতিহাসিক হোরেস ওয়ালপোল ৯ ডিসেম্বর ১৭৪৫ তারিখের এক চিঠিতে ফ্লোরেন্সে তাঁর এক বন্ধুকে লিখছেন যে ব্রিটিশ সরকার সিনজার্মান নামে একজন অদ্ভুত লোককে গ্রেফতার করেছে। লোকটি লণ্ডনে বছর দুই হলো রয়েছে কিন্তু নিজের পরিচয় দিচ্ছে না। লোকটি সুন্দর সঙ্গীত রচনা করতে পারে। যেমন চমৎকার গান গায় তেমনি চমৎকার বেহালা বাজায়। কেউ বলে লোকটি ছিটগ্রস্ত। সে যে কোন্ দেশের নাগরিক তাও জানা যাচ্ছে না, ইটালিয়ান, স্পেনিয়ার্ড বা পোল্যাণ্ড, যে কোনো দেশের লোক

হতে পারে। সে নাকি মেকসিকো থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে কনস্টান্টি-নোপলে পালিয়ে গিয়েছিল। সে যে-কোনো দেশ বা পেশার মানুষ হতে পারে তবে তার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ, বয়সও ঠিক করা যায় না। বিচারের জন্যে তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

প্রফেসর আনাতলি আপনি শুনে অবাক হবেন যে কাউন্ট যে-কোনো বাদ্যযন্ত্র দক্ষ শিল্পীর মতো বাজাতে পারে কিন্তু এমন কখনও শুনেছেন কি যে কোনো লোক একই সঙ্গে দু'খানা কাগজে দু' হাত দিয়ে দুটি পৃথক কবিতা লিখতে পারে? কাউন্ট তা পারত। তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেন কাউন্টের মাথার চুল কালো, দাঁত মজবুত, সুঠাম শরীর, চামড়া কোথাও কুঁচকোয় নি।

১৭৬২ সালে কাউন্ট রাশিয়ায় এসে জার তৃতীয় পিটারের বিরুদ্ধে এক রাজনীতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই ষড়যন্ত্রের ফলে ক্যাথারিন দি গ্রেট ক্ষমতা লাভ করে। কাউন্ট সম্ভবত যোগ অভ্যাস করে। সে তিব্বতে অনেকদিন পোটালা প্রাসাদে দালাই লামার সঙ্গে ছিল। সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে আমি বিশ্বাস করি কিন্তু সে যে এখন কোথায় আছে তা আমার জানা নেই।

প্রফেসর আনাতলি ও আর সকলে ধৈর্যের সঙ্গে নিকোলায়েভের বিবৃতি শুনলেন। নিকোলায়েভের মতো একজন গুণী ব্যক্তি বললেন বলেই সকলে তাঁর কাহিনী অগ্রাহ্য করতে পারলেন না, অন্য কেউ বললে তাঁরা অবিশ্বাস করতেন। নিকোলায়েভ যা বলে জেনেশুনে বলে, না জেনে কিছু বলে না।

প্রফেসর আনাতলি বললেন বেশ তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি এবং আমি কেজিবি-কে অনুরোধ করব তাকে খুঁজে বার করতে এবং যদি কেউ তা পারে, তা কেজিবি পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

একজন বলল, প্রফেসর তাহলে আপনি আজই কাউকে মসকো পাঠান কারণ টেলিফোনে এ কাজ হবে না।

প্রফেসর আনাতলি বললেন, ঠিক আছে আমি এখনি ব্যবস্থা করছি। এলেনা তুমিই যাও, তুমি তো সব শুনলে, কর্তাদের বুঝিয়ে বলতে পারবে। আমি সঙ্গে চিঠি দিয়ে দিচ্ছি, তুমি তৈরি হও, দুপুরের প্লেনেই যাবে।
এলেনা বলল, বেশ আমি সব এখনি গুছিয়ে নিচ্ছি।

এলেনা মসকোয় পৌঁছে পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে সব বলল। ফার্স্ট সেক্রেটারি তো ব্যাপারটা সব জানতেন, সেই সাউথ পোলে আইভানের বডি আবিষ্কৃত হওয়ার সময় থেকে টোমস্ক ইনস্টিটিউটে আনা পর্যন্ত। ফার্স্ট সেক্রেটারি এলেনার মুখে সব শুনে বুঝলেন যে প্যাপিরাস লিপির পাঠ উদ্ধার করতে না পারলে আইভানের প্রকৃত পরিচয় জানা যাবে না। অথচ আইভানের প্রকৃত পরিচয় যদি জানা যায় এবং প্রমাণিত হয় যে সে সত্যই আটলানটিসের মানুষ তাহলে রাশিয়া প্রমাণ করতে পারবে যে মানুষের জানা আর্য সভ্যতারও আগে পৃথিবীতে আর একটা সভ্যতা ছিল।
প্রফেসর আনাতলি লিখেছেন যে প্রফেসর নিকোলায়েভের কাহিনী শুনে তাঁর বিশ্বাস হয়েছে যে সেই প্রবাদ-পুরুষ সিনজার্মেনকে যদি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে হয়তো প্যাপিরাস লিপি তথা আটলানটিস রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।
ফার্স্ট সেক্রেটারি চিঠির গুরুত্ব বুঝতে পেরে এলেনাকে বললেন যে এ বিষয়ে সব ব্যবস্থা করবেন কিন্তু ইতিমধ্যে টোমস্ক ইনস্টিটিউটে প্রফেসারেরা যেন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থাকেন। তাঁরাও যেন প্যাপিরাস লিপি পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন কারণ সেই রহস্যময় সিনজার্মানকে না পাওয়াও যেতে পারে এবং পাওয়া গেলেও যে সে সাহায্য করতে পারবে তাও বলা যায় না। তবে এজন্যে যা কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হবে সবই করা হবে।
ফার্স্ট সেক্রেটারির কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে এলেনা ফিরে এসে প্রফেসর আনাতলিকে সব রিপোর্ট করল। ফার্স্ট সেক্রেটারি প্রফেসর আনাতলিকে একখানা চিঠিও দিয়েছিলেন।

কেজিবি সংগঠন সারা পৃথিবীব্যাপী। পৃথিবীর সর্বত্র তাদের লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু কাজ সোজা নয়। কাউন্ট সিন-জার্মেন যদিও বেঁচে থাকে তাহলে তিনি কোথায় কি মূর্তিতে আছে তা জানা নেই অতএব কাজ বেশ কঠিন।

তবে অমন সর্ববিদ্যাবিশারদ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। এ কথাও ঠিক যে তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান, যদি টের পান যে রাশিয়ানরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাহলে তিনি নিজের পরিচয় দেবেন কি না।

তবুও কেজিবি-এর ওপর আদেশ জারী করা হলো যেখান থেকে পার সেই আশ্চর্য মানুষকে খুঁজে বার কর।

কোনো বিখ্যাত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি আত্মগোপন করে থাকেন তাহলে তাঁকে খুঁজে বার করা কঠিন কাজ কিন্তু কেজিবি-এর ভেতরে বিখ্যাত না হলেও বেশ কিছু প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে। তারা উঠে পড়ে লাগল এবং পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে কোন্ ধরনের মানুষের মধ্যে কাউন্ট সিন-জারমেনকে পাওয়া যেতে পারে তার একটা ছক তৈরি করে দেশে বিদেশে কেজিবি এজেন্টদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তাদের ওপর কড়া আদেশ দেওয়া হলো যে ব্যাপারটা যেন সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়, কিছুতেই যেন ফাঁস না হয়। ফাঁস হলে বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড।

এক বছর কেটে গেল কিন্তু কোথায় সেই ধুরন্ধর কাউন্ট। কোনো কোনো রাজধানী থেকে খবর এলো যে কয়েকজন ব্যক্তি তাঁর নামটাই শুনেছেন মাত্র, বেশির ভাগ ব্যক্তি তাঁর নামটাই জানেন না।

এবার কেজিবি হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ গেল যেখানে যেখানে সরকারী বা বেসরকারী গ্রন্থাগার আছে, গবেষক সেজে সেখানে খোঁজ কর। তাঁর বিষয়ে কিছু পেলেও পেতে পার।

প্রায় এক বছর পরে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস থেকে একজন এজেন্ট একটা খবর দিলো। লাইব্রেরি নয়, কারাকাসে একজন ধনী ব্যক্তির ব্যক্তিগত একটা সংগ্রহশালা আছে। সেই সংগ্রহশালায় কয়েক আল-

মারি খুব পুরনো বই ও প্রাচীন পুঁথি আছে।

সেই সংগ্রহশালার কিউরেটরের কাছ থেকে জানা গেল যে মাঝে মাঝে একজন বয়স্ক ব্যক্তি আসেন। এখানে বসে পুরনো বই বা পুঁথি দেখেন, তারপর চলে যান। তাকে দেখে অভিজাত, বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ বলেই মনে হয় কিন্তু তাঁর যে বয়স কত তা বলা যায় না কারণ কিউরেটর তাঁকে গত দশ বছর ধরে একই রকম দেখছে। উজ্জ্বল চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দাড়ি গোঁফ কামানো ; খাড়া নাক, দেখলে মনে শ্রদ্ধা জাগে। না, কিউরেটর তার নাম জানে না, ঠিকানাও জানে না। সংগ্রহশালার মালিক কিউরেটরকে অনুমতি দিয়ে রেখেছেন তিনি এলে তাঁর যেন কোনো অসুবিধা না হয় এবং তিনি যা চাইবেন, বই বা পুঁথি তা যেন দেওয়া হয়।

এজেন্ট প্রশ্ন করে মালিক কি তাঁর নাম জানে? কিউরেটর তা বলতে পারল না। মালিকের সঙ্গে দেখা করা যায়? না, মালিক এখন লণ্ডনে আছেন। এজেন্ট প্রশ্ন করে, সেই ভদ্রলোক কবে এসেছিলেন এবং আবার কবে তাঁকে আশা করা যেতে পারে।

কিউরেটর বলল, তিন মাস আগে এসেছিলেন। সেই সময় পরপর সাত দিন এখানে এসেছিলেন। তাঁর আবার আসার সময় হয়েছে, যে কোনোদিন এসে যেতে পারেন।

এজেন্ট অবশ্য ছদ্মবেশে এসেছিল। নিজের পরিচয় দিয়েছিল একজন গবেষক বলে। বলেছিল যে সে প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করছে। সে তখন কিউরেটরকে অনুরোধ করল যে সংগ্রহশালার পাঠাগারে তাকে বইগুলি দেখার সুযোগ দেওয়া হোক। কিউরেটর বললেন, সব বই ইস্যু করা হয় না এমন কি পাঠাগারে বসেও দেখতে দেওয়া হয় না কারণ বইগুলি খুব জীর্ণ হয়ে গেছে। তবে তিনি বইয়ের ক্যাটালগ দেবেন, কোন্ বই প্রয়োজন জানালে সেই বই দেওয়া যায় কিনা দেখা যাবে।

এজেন্টের উদ্দেশ্য তো আর বই পড়া নয়। তার উদ্দেশ্য সেই রহস্যময় ব্যক্তিকে দেখা। চেহারার বর্ণনার সঙ্গে যদি মেলে তাহলে অনুসরণ করে

এখানে তাঁর আস্তানায় যাওয়া ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

পরদিন সকালে এজেণ্ট সেই সংগ্রহশালায় এলো। কিউরেটর তাকে ক্যাটালগ দিলেন। যে সব বই ইস্যু করা যাবে না সেই সব বইয়ের নামের পাশে তা লেখা আছে। এজেণ্ট সেদিকে গেল না। সে একখানা বইয়ের নাম লিখে পেশ করল। বইখানায় কিছু ছবি আছে। এজেণ্টটি ভালো ছবি আঁকতে পারে। কিছু প্রাচীন মুদ্রা ও পাতের এবং অন্যান্য জিনিসের ছবি আছে। সে তার খাতায় সেই ছবিগুলি আঁকতে লাগলো। সময় কাটাতে হবে তো!

এইভাবে কুড়ি দিন কাটল। এদিকে বইয়ের ছবিও শেষ হয়ে এলো। একদিন সে এক মনে বসে ছবি আঁকছে হঠাৎ তার নাকে চন্দনের সুন্দর গন্ধ এলো।

চন্দনের গন্ধ কোথা থেকে আসে? এজেণ্ট মুখ তুলে দেখল একটু দূরে এক সুদর্শন অভিজাত ব্যক্তি বসে রয়েছেন। পরনে সিলকের পোশাক। ইণ্ডিয়ার লোকেরা যেমন পাঞ্জাবী পরে এই ভদ্রলোকের জামাটা সেই রকম। এজেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল, এতদিন যার অপেক্ষায় সে বসে আছে সে লোক না হয়ে যায় না।

তিনি গদি আঁটা একটা বেশ বড় চেয়ারে বসে কিউরেটরের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁরই দেহ থেকে চন্দনের সুবাস আসছে। এজেণ্ট অবশ্য নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

আগন্তুকের অনুরোধে আলমারি থেকে বই বার করতে যাবার সময় কিউরেটর এজেণ্টকে বলে গেল এই সেই লোক। এজেণ্ট তো আগেই বুঝতে পেরেছিল তাই কিছু বলল না।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ভদ্রলোক উঠলেন। এজেণ্ট তার অনুসরণ করে বাইরে এলো। বাইরে একটা প্রাইভেট ট্যাকসি অপেক্ষা করছিল, তিনি তাতে উঠলেন। এজেণ্টও একটা ট্যাকসি নিল।

কারাকাসের সর্বাপেক্ষা অভিজাত হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড়াল। হোটেলের সামনে গাড়ি থামল। তিনি গাড়ি থেকে নেমে আস্তে আস্তে

এগিয়ে চললেন। এজেন্ট পা চালিয়ে তাঁর আগে লাউঞ্জে পৌঁছে অপেক্ষা করতে লাগল।

কাউন্ট লাউঞ্জে আসতেই এজেন্ট এগিয়ে নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অনুচ্চস্বরে প্রশ্ন করল আমি সেই সম্মানিত মহাপুরুষ কাউন্ট সিনজার্মেনের সঙ্গে কথা বলছি ?

ওরে বাব্বা, সম্মানিত মহাপুরুষ, কি সব বলছ তুমি ? তবে হ্যাঁ আমিই সেই কাউন্ট সিনজার্মেন, দি ওয়ান অ্যাণ্ড ওনলি ওয়ান, তা তুমি আমাকে খুঁজে বার করলে কি করে ?

বলতে তো সময় লাগবে, দয়া করে যদি সময় দেন।

দিতে পারি তবে এখন এবং এখানে নয় কারণ এখানে আর একজন দেখা করতে আসবেন আর কাল ভোরে আমি আমার আস্তানায় ফিরে যাব।

আপনার আস্তানার ঠিকানা যদি বলেন তাহলে আমি সেখানেও যেতে পারি।

যদি বলি আমি নিউইয়র্ক বা নিউ দিল্লিতে থাকি তাহলে কি তুমি সেখানে যাবে ?

আপনি যদি বলেন নর্থপোল তাহলেও যাব।

তাহলে তো ব্যাপারটা খুব জরুরী মনে হচ্ছে। না, অতদূরে নয়, আমি থাকি এখান থেকে তিনশ মাইল দূরে অরিনকো নদীর ধারে ছোট একটা শহরে নাম তুচুপিটা। এখান থেকে সকালে ডিল্যুক্স বাস ছাড়ে। এখান থেকে বাসে যাবে বারসিলোনা, হ্যাঁ এখানেও একটা বারসিলোনা আছে, সেখানে বাস বদলাবে। সে বাসটা তুচুপিটা পর্যন্তই যায়। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে আমার বাংলো এক কিলোমিটার, কাউকে জিজ্ঞাসা কোরো আমার বাংলোর নাম 'অরিনকো ভিউ' আমি অবশ্য কাল বিকেলে পৌঁছব, তুমি বরঞ্চ পরশু সকালের প্রথম বাসে যেয়ো, লাঞ্চের আগে তুচুপিটা পৌঁছে যাবে, তোমার নামটা কি বলো তো, আমি লিখে রাখব।

আমার নাম মার্ক টিউনিস। বলা বাহুল্য এজেন্ট নিজের নাম বলল না।

ঠিক আছে, তাহলে পরশু আফটার লাঞ্চ।

ভারি সুন্দর বাংলো এই 'অরিনকো ভিউ'। মস্ত বড় কম্পাউণ্ড, চারদিকে লম্বা লম্বা গাছ, মাঝে ফুলের বাগান। বাংলোটিকে এমন সুন্দর রং দেওয়া হয়েছে যে মনে হয় যেন ভালো আর্টিস্টের আঁকা একখানা পেন্টিং। বাংলো দেখে তো মনে হচ্ছে কাউন্ট রীতিমতো ধনী।

কোনো লোক দেখা গেল না। মার্ক টিউনিস কাঠের গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। বাংলোর বারান্দায় উঠে দেখল একটা পেতলের ঘণ্টা ঝুলছে। কি মনে করে মার্ক ঘণ্টাটা নেড়ে দিলো।

ঘণ্টার শব্দ শুনে ঘরের ভেতর থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন। হাতে প্যাড ও পেনসিল বোধহয় কাউন্টের পি এ। মহিলা জিজ্ঞাসা করল: কারাকাস থেকে আসছ? মার্ক টিউনিস আমার সঙ্গে এস, কাউন্ট তোমার জন্যে লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছে।

মহিলাকে অনুসরণ করে মার্ক লাইব্রেরিতে এলো। লাইব্রেরি দেখে তো মার্ক অবাক। এত বড় লাইব্রেরি! এ যে বিরাট। চারদিকে ও মাঝে মাঝে বড় বড় আলমারি, এখানে সেখানে রিভলভিং শেলফ, ওধারে দুটো বড় টেবিলের ওপরও বই আর বই। একজন লোকের যে এত বই থাকতে পারে তা দেখে তো মার্ক অবাক।

কাউন্ট একটা ইজি চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। হাতে একখানা বই। বইখানা সরিয়ে কাউন্ট বললেন:

এস এস মার্ক এস, কি বই দেখে অবাক হচ্ছ? এই বাংলোয় এরকম আরও দুটো ঘর আছে, সেখানেও বই আছে। একা থাকি বইই আমার সঙ্গী, বই পড়েই সময় কাটাই। হ্যাঁ, সব বই আমি পড়েছি, বয়স তো কম হলো না। সে কথা যাক, তুমি বরঞ্চ ঐ চেয়ারটায় আরাম করে বোসো, লাঞ্চ করেছ?

হ্যাঁ, বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই একটা রেস্তরাঁয়···

ও ঐ 'গ্রেট বাফেলো' রেস্তরাঁ তো, এবার বল তোমার কি দরকার।

মার্ক টিউনিস সমস্ত ঘটনাটাই বলল, সাউথ পোলে বডি পাওয়া থেকে আরম্ভ করে প্যাপিরাস লিপি পর্যন্ত।

কাউন্ট ধৈর্য ধরে সব শুনলেন, একবারও বাধা দেন নি বা মাঝে একটাও প্রশ্ন করেন নি। মার্ক তার কথা শেষ করলে কাউন্ট বললেন :

তাহলে তোমার প্রফেসর আনাতলির ধারণা যে ঐ প্যাপিরাস লিপির পাঠোদ্ধার আমি করতে পারব, তার আগে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি আইভানের বডিটা এখন কোথায় আছে এবং প্যাপিরাস লিপির কোনো ফটো কপি তোমার সঙ্গে আছে কি ?

আইভানের ডেডবডি টোমস্ক ইনস্টিটিউটে আছে, না আমার সঙ্গে প্যাপিরাস লিপির কোনো ফটো কপি নেই। এখন আমাকে বলুন আপনি আমাদের প্রস্তাবে রাজি আছেন কি না ?

শোনো মার্ক, তুমি এক কাজ কর, তুমি তোমার কর্তাদের লিখে আগে আমাকে ঐ প্যাপিরাস ম্যানাসক্রপটের ফটোস্টাট কপি আনিয়ে দাও, আমি সেটা দেখে আমার মতামত জানাব।

বেশ তা আমি করছি, আশা করছি আগামী সপ্তাহে ওটা এসে যাবে কিন্তু তার আগে আমাকে একটা কথা বলুন, প্যাপিরাস লিপির ফটোস্টাট কপি দেখে আপনি যদি আমাদের প্রস্তাবে রাজি হন তাহলে কি আপনি টোমস্ক যাবেন ? আমরা অবশ্য আপনার জন্যে চার্টার্ড প্লেনের ব্যবস্থা করে দোব।

হ্যাঁ যাব, ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেল যেদিন প্রথম চালু হয় সেদিন আমি প্যাসেঞ্জার ছিলুম, এখন তো মসকো থেকে ইরখুটস্ক পর্যন্ত ইলেকট্রিক হয়ে গেছে না ?

হ্যাঁ কাউন্ট, আপনি কি ট্রেনে যাবেন নাকি ?

না, ট্রেন জার্নিতে এখন আর সে থ্রিল নেই আমি যদি যাই তো প্লেনেই যাব, তাহলে কথা হয়ে গেল।

হ্যাঁ, কাউন্ট, ধন্যবাদ, আমি তাহলে এখন উঠি।

বোসো বোসো কফি খেয়ে যাও, ফিরতি বাসের এখনও দেরি আছে, একটা কথা মনে রেখ, আমার সঙ্গে যে দেখা হয়েছে এ কথা কাউকে বলবে না তোমার কর্তাদের ছাড়া, আমি এখানে আছি এটা প্রকাশ হয়ে পড়লে আমি

আর টিকতে পারব না, বাকি কটা দিন আমি শান্তিতে থাকতে চাই, হ্যাঁ আর একটা কথা, তোমাদের কাজ যদি হাতে নিই এবং সফল হই তাহলে আমাকে মাসে হাজার ডলার পেনসন দিতে হবে। যতদিন বাঁচব, এটাও জানিয়ে দিয়ো।

কফি খেয়ে কাউন্টকে আর এক প্রস্থ ধন্যবাদ জানিয়ে মার্ক টিউনিস বিদায় নিল।

দশ দিনের মাথায় মার্ক টিউনিস তুচুপিটায় ফিরে এলো, সঙ্গে সেই প্যাপিরাস লিপির ফটো কপি। বিশেষ ধরনের ক্যামেরায় বিশেষ ধরনের আলো ফেলে ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছে। খুব ভালো ছবি উঠেছে, খুব স্পষ্ট।

কাউন্ট ছবির প্রশংসা করলেন। সেইগুলি তিনি কাছে রাখলেন কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। মার্ককে বললেন তিন দিন পরে আসতে, তখন তিনি তার মতামত জানাবেন।

মার্ক বলল, তবু কিছু বলুন।

কাউন্ট বললেন, ছবি নিঃসন্দেহে খুব ভালো উঠেছে কিন্তু যার ওপর কিছু লেখা হয়েছে সেটা সম্ভবতঃ প্যাপিরাস নয়, সে যাই হোক এটা খুবই পুরাতন, তুমি তো বললে তোমাদের বিজ্ঞানীরা কার্বন-ফোরটিন সাহায্যে এর বয়স স্থির করেছে বারো হাজার বছর কিন্তু এগুলি এই সুদীর্ঘ সময় খোলা আকাশের নিচে বরফে প্রোথিত ছিল। প্রকৃতি তার কাজ করেছে আর এই প্রকৃতি ছিল নিষ্ঠুর তাই অনেক অংশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। যাই হোক তিন দিন পরে তুমি এস আমি দেখি কি করতে পারি।

তিন দিন পরে মার্ক টিউনিস আবার তুচুপিটায় ফিরে গেল। কাউন্ট খুব গম্ভীর। চিবুকে হাত রেখে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন। সামনে সেই প্যাপিরাস লিপির ফটো কপি সাজান, মোট বারোখানা লিপি। ঘরে চন্দন ধূপের গন্ধ।

মার্ক টিউনিস লক্ষ্য করল কাউন্ট একখানা কাগজে সেই লিপির মতো অক্ষর বা ক্ষুদ্র ছবিগুলি তুলেছেন, তার নিচে কিছু লিখেছেন। এই রকম ভাবে তিনি কয়েকখানা কাগজে লিখেছেন। পাশে কয়েকখানা মোটা বই।

একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণও রয়েছে।

কৌতূহলী হয়ে মার্ক জিজ্ঞাসা করল লিপিগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা? আপনি সংস্কৃত জানেন?

বারো হাজার বছর আগে আমাদের জানা কোনো ভাষার জন্ম হয় নি তবে সংস্কৃত হলো প্রাচীনতম ভাষা। যে ভাষায় এই লিপি সে ভাষা সংস্কৃতর পিতা হতে পারে কি না দেখছিলুম তাহলে পড়ার কাজ সহজ হতো, তবুও আমি কিছু এগিয়েছি, তিন দিনে আর কি হবে?

আপনি কি স্থির করলেন?

আমাকে যেতে হবে, আমি টোমস্ক যাব। আমি আইভানের বডি দেখতে চাই, কেন দেখতে চাই তা আমি বলব না, তুমি তোমার কর্তাদের খবর পাঠাও। আমি যে টোমস্ক যাব কেউ যেন জানতে না পারে, মনে রেখ।

তাহলে কাউন্ট আমি প্লেন আনাবার ব্যবস্থা করি?

না, তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমার যেতে দেরি আছে। আমি যাব এক মাস পরে, আমি নিজেই যাব। তুমি আমার আগে টোমস্ক গিয়ে, আমার জন্যে অপেক্ষা করবে, আমার সঙ্গে ওখানকার সকলের পরিচয় করিয়ে দেবে।

আপনি একা যেতে পারবেন? এতখানি পথ?

সে তোমাকে ভাবতে হবে না, গত বছর আমি এই সময়ে তিব্বতে ছিলুম। আমার প্রস্তাব জানিয়েছিলে? তোমার কর্তারা কি বলেছেন?

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, নিশ্চয়, ওঁরা বলেছেন কাজ উদ্ধার হলে তুমি যা চাইবে তাতেই ওঁরা রাজি হবেন।

বেশ ভালো কথা। তুমি তাহলে টোমস্ক চলে যাও। আমি সামনের মাসে পঁচিশ তারিখে টোমস্ক পৌঁছব। তুমি প্রথমে আমাকে চিনতে পারবে না। এই ছবিখানা নিয়ে যাও, এই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেবে।

মার্ক টিউনিসকে কাউন্ট একখানা ছবি দিলেন। ছবিখানা দেখে মার্ক বলল, এ তো দেখছি একজন টিবেটান লামার ছবি?

হ্যাঁ, ঐ ছদ্মবেশে যাব, যদি বল তো আমি কসাক সৈন্যের বেশেও যেতে

পারি।

আপনি এই লামার বেশেই যাবেন।

অসাধারণ লোক এই কাউন্ট। বিস্ময়ে তার দিকে মার্ক কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বলল, কাউন্ট আপনি যদি সাহস দেন তো আপনাকে আমি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই।

আমার বয়স কত ? এই তো ? আমার বয়স হয়েছে, আমার বয়সী মানুষ তিব্বতে আর তোমাদের টার্কিস্তানে কয়েকজন আছে, তবে যত বয়স শুনেছ অত বয়স আমার হয় নি !

না কাউন্ট বয়স নয়, শুনেছি আপনি নাকি এই পৃথিবীর মানুষ নন, আপনি নাকি ভেনাস প্ল্যানেটের মানুষ ?

ভেনাসে মানুষ বা কোনো জীব আছে বলে তোমাদের বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন নাকি ? আর থাকলেও সেই জীব বা মানুষের চেহারা পৃথিবীর জীব ও মানুষের মতো একই রকম হওয়া সম্ভব নাকি ? ভেনাস কত দূর জান বোধহয়, সেখান থেকে যাওয়া আসা এতই সহজ ? ও সব বাজে কথার প্রশ্রয় দিয়ো না, আমি নিজের বিষয় কিছু বলতে চাই না, তোমার কর্তাদের জানিয়ে রেখো আমাকে যেন কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন না করেন। আচ্ছা আজ এই পর্যন্ত, আর দেখা করার দরকার নেই। সামনের মাসের ২৫ তারিখে আমি তোমাদের টৌমস্ক ইনস্টিটিউটে হাজির হব।

আশ্চর্য এই মানুষ ! ভাবতে ভাবতে মার্ক টিউনিস বিদায় নিল।

টৌমস্ক ইনস্টিটিউটে রীতিমতো সাড়া পড়ে গেছে। সাড়া পড়ার প্রধান কারণ কাউন্ট সিনজার্মেন আবিষ্কার। প্রফেসর নিকোলায়েভের মুখে কাউন্টের কাহিনী শুনে প্রফেসর আনাতলি পুরো বিশ্বাস করতে পারেন নি। সর্ব-গুণসম্পন্ন সর্ববিদ্যাবিশারদ এমন দীর্ঘায়ু মানুষ থাকতে পারে নাকি। কিন্তু মার্ক টিউনিস যখন কাউন্টের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির উল্লেখ করল বই ছাড়া আর কি কি বস্তু এবং দেওয়ালে টাঙানো কি ছবি দেখেছে তার উল্লেখ করল তখন প্রফেসর আনাতলির বিশ্বাস হলো।

কাউন্টের আসতে যখন সাত দিন বাকি সেই সময়ে কাউন্টের কাছ থেকে একখানা চিঠি এলো। রাশিয়ান ভাষাতেই লেখা এবং প্রফেসর আনাতলির নামে। পুরো চিঠিখানা টাইপ করা, কাউন্ট নিজের নামটাও টাইপ করে-ছেন।

তিনি লিখেছেন পঁচিশ তারিখেই তিনি টৌমস্ক পৌছবেন ঠিক বেলা দশটায় কিন্তু তাঁর জন্যে একটা সাউণ্ড প্রুফ ঘর চাই। কেন চাই টৌমস্ক পৌঁছে বলবেন। যেন ব্যবস্থা করে রাখা হয়।

কাউন্টের থাকবার জন্যে একটা বাংলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে তবে সে বাংলোয় কোনো সাউণ্ড প্রুফ ঘর নেই তবে ইনস্টিটিউটের মেন বিলডিং-এ একখানা সাউণ্ড প্রুফ ঘর আছে কিছু এক্সপেরিমেণ্ট করবার জন্যে। ঘর-খানা খালি করে রাখা হলো।

পঁচিশ তারিখ এলো। বেলা দশটা বাজতে না বাজতেই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা গেটের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দলে মার্ক টিউনিসও আছে।

কাউণ্ট কি ভাবে আসবেন তা জানা নেই। ট্রেনে আসবেন নাকি? তাহলে তো স্টেশনে অপেক্ষা করলে চলত। কিন্তু ঐ সময় কোনো ট্রেন নেই। কাউণ্ট কিন্তু আগেই চলে এসেছেন। তিনি আগে এসেছিলেন পাকিস্তানে। সেখানে পিশাচসিদ্ধ এক পীর আছেন। কাউণ্ট তাঁর সঙ্গে দেখা করে দিল্লি যান। দিল্লি থেকে মসকো যান, মসকো থেকে প্লেনে আসেন টৌমস্ক।

এই ভ্রমণের সময় তিনি কয়েকবার বেশ পরিবর্তন করেছেন। টৌমস্কে যখন পৌঁছলেন তখন তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল কোনো বিজ্ঞানী বুঝি। তারপর কাউণ্ট ছদ্মবেশে ইনস্টিটিউটের আশপাশ ঘুরেছেন, কি যেন খুঁজে বেড়িয়েছেন।

উঠেছিলেন ছোট একটা হোটেলে। পঁচিশ তারিখে তিনি তিব্বতীলামার বেশ ধারণ করলেন তারপর একটা ঘোড়া ভাড়া করলেন। ঘোড়ার মালিককে বলে দিলেন সে যেন ঠিক দশটার সময় টৌমস্ক ইনস্টিটিউটের গেটে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে। ভাড়া তিনি আগেই দিয়ে রাখলেন।

দশটা বাজতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কিন্তু কেউ বুঝতে পারছে না কাউন্ট আসবেন কিসে কারণ এই সময়ে কোনো ট্রেন্ বা প্লেন আসে না, কোনো বাসও আসে না। দু একজন সন্দেহ প্রকাশ করলেন, বললেন মার্ককে ধোঁকা দিয়েছে। এরকম কোনো মানুষ আজকালকার যুগে থাকতে পারে নাকি ?

মার্কের বুক ঢিব ঢিব করছে। তারও মনে সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করেছে। তার বড় কর্তারা বলেছে লোকটি যদি সত্যিই কাউন্ট হয় এবং কাজ উদ্ধার করে দেয় তাহলে মার্ককে একটা ভালো প্রমোশন দেওয়া হবে কিন্তু কাউন্ট যদি না আসে তাহলে তো তার সাজা হয়ে যাবে।

এমন সময় দূরে রাস্তার বাঁকে গাছের ফাঁকে একজন মানুষকে দেখা গেল ঘোড়ায় চেপে গ্যালপ করে আসছে। মার্ক হাততালি দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, ঐ দেখুন কমরেডরা, টিবেটান লামা অন হর্স ব্যাক, ঘোড়ায় চেপে আমাদের কাউন্ট আসছেন।

ঘড়িতে তখন দশটা বাজতে মাত্র তিন মিনিট বাকি। ঠিক দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কাউন্ট গেটে পৌঁছে গেলেন। মার্ক টিউনিস স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করল।

কাউন্ট ঘোড়া থেকে নামলেন। ঘোড়াওয়ালা কোথাও অপেক্ষা করছিল। সে এসে ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে গেল। মার্ক প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। কাউন্ট রুশ ভাষাতে 'দ্রাস্তুই' বলে কথা আরম্ভ করলেন।

কাউন্টের ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ। তাঁকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসানো হলো। প্রথমেই আনাতলি জিজ্ঞাসা করল আপনি ঘোড়ায় চেপে কোথা থেকে এলেন।

কাউন্ট সংক্ষেপে বললেন, তিনি আগেই টোমস্কে এসেছেন। একটা হোটেলে ছিলেন, সেখান থেকে এখন আসছেন।

তাহলে আপনি এখন আপনার বাংলোয় চলুন। বিশ্রাম করুন। লাঞ্চের পর আপনাকে আমরা ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসব, তখন কথাবার্তা আরম্ভ করা যাবে। আপনার হোটেলের নামটা বলুন, আপনার মালপত্তর আনিয়ে

নিই।

খালি একটা বড় চামড়ার ব্যাগ আছে কিন্তু আমি এখনি আইভানের বডি দেখতে চাই।

বেশ চলুন।

ওপরে একটা ঘরে একটা কাঁচের আধারে নির্দিষ্ট তাপে আইভানের ডেড-বডি সযত্নে রাখা ছিল।

কাউন্ট অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বডি দেখলেন। বডি সম্পূর্ণ নগ্ন করে রাখা ছিল। কাউন্ট কয়েক জায়গা বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্পর্শ করে রইলেন। তারপর বললেন, ওর পোশাকের অবশিষ্ট অংশ এবং জুতো দেখতে চাই।

তাও দেখানো হলো। এরপর তিনি নিচে আনাতলির ঘরে নেমে এসে প্যাপিরাসের লিপিগুলি উলটে-পালটে দেখলেন। মন্তব্য করলেন যে তিনি অনেক প্যাপিরাস লিপি দেখেছেন কিন্তু এগুলি প্যাপিরাস নয়, কি তা এখনি বলতে পারছেন না, পরে হয়তো বলতে পারবেন। তারপর আনা-তলিকে জিজ্ঞাসা করলেন সাউণ্ড প্রুফ ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা।

হ্যাঁ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাহলে আপনারা ঐ ঘরে আইভানের ডেডবডিটা ট্রান্সফার করে দিন। এছাড়া ঘরে আমার চাই ছোট একটা টেবিল আর টেবিলের দুপাশে দু-খানা চেয়ার, ব্যস্। আমার আর কিছু চাই না। আশা করি আপনাদের কাজ উদ্ধার করে দিতে পারব।

আনাতলি জিজ্ঞাসা করল লোকটি কি আটলানটিসের বলে আপনার অনুমান নয়?

অনুমান নয়, আমি বিশ্বাস করি আইভান আটলানটিসের মানুষ।

বিশ্বাস করেন?

হ্যাঁ, আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেন নি। ওর ডান হাতে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া আটলানটিসের প্রতীক চিহ্ন আছে যাকে আমরা ক্রস অফ আট-লানটিস বলি, দেখবেন পর পর তিনটি বৃত্তের ওপর একটা ক্রশ আঁকা আছে।

তাই নাকি ? আমরা তো এখনি গিয়ে দেখব, কিন্তু প্রতীকটার অর্থ কিছু জানেন ?

জানি, আটলানটিসে প্রথম রাজা পসিডন তার তুর্গ রক্ষা করবার জন্যে বৃত্তাকারে এবং তাদের ওপর দিয়ে ক্রস আকারে গভীর খাল খুঁড়িয়ে ছিলেন। সেই খাল সমষ্টির নকশা হলো আটলানটিসের প্রতীক চিহ্ন, ক্রস অফ আটলানটিস।

এই খালের বিষয় তো আমরা জানি কিন্তু চিহ্নটা আইভানের হাতে আমাদের নজরে পড়ে নি।

আমি আজ সন্ধ্যাতেই কাজ আরম্ভ করব তার আগে সাউণ্ড প্রুফ ঘরে আইভানকে এবং টেবিল চেয়ার সব পাঠিয়ে দেবেন।

আপনি কতক্ষণ কাজ করবেন ? রাত্রে ডিনার খাবেন কোথায় ?

আপনাদের সঙ্গেই খাব তারপর আমি আবার কাজ আরম্ভ করব।

প্যাপিরাস লিপি বা যাই হোক সেটার কিছু ব্যবস্থা করতে পেরেছেন কি ? আনাতলি জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ, আমি পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি তবে সেটা আমাকে যাচাই করতে হবে কিন্তু কি করে যাচাই করব আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। আশা করছি আমি এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারব।

তা সেই কাগজপত্র মানে আপনি যা লিখেছেন তা কি আমাদের এখন দেবেন ? আমরা একটু পড়ে দেখতুম।

যথাসময়ে পাবেন।

কাউন্ট কথাগুলো এমন স্বরে বললেন যে ওরা আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করল না।

কাউন্ট তাঁর জন্যে নির্ধারিত বাংলোয় চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আইভানের দেহ সাউণ্ড প্রুফ ঘরে পাঠিয়ে দিলো। আইভান সেই কাঁচের আধারেই রইল। কারণ তার দেহটা একটা বিশেষ তাপে ও চাপে রাখা আছে, ওরা তার তারতম্য ঘটাতে চায় না।

কাউন্ট চলে যাবার পর একজন বিজ্ঞানী আনাতলিকে জিজ্ঞাসা করলেন,

আচ্ছা প্রফেসর লোকটিকে দেখে অবশ্য আমার মনে হয়েছে উনি একজন অসাধারণ মানুষ, একটু স্বতন্ত্র ধরনের ব্যক্তিত্ব ওঁর আছে কিন্তু উনিই যে সেই কাউন্ট সিনজার্মেন তা আমরা জানব কি করে? কেউ তো ওঁকে সনাক্ত করে নি?

আনাতলিও একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। তিনি বললেন, সে ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। তবে মার্ক টিউনিস যা দেখে এসেছে, অর্থাৎ ওঁর লাইব্রেরী যা নাকি অনেক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকে ভর্তি তা শুনে আমার মনে হচ্ছে লোকটি যদি স্বয়ং কাউন্ট সিনজার্মেন নাও হয় তাহলেও নিঃসন্দেহে একজন জ্ঞানতপস্বী। ঠিক আছে, লাঞ্চের সময় গল্পচ্ছলে আমরা একটু যাচাই করে নোব কিন্তু প্রফেসর আপনার এই সন্দেহের কথা কাউকে ঘুণাক্ষরেও বলবেন না।

আপনি কি করে যাচাই করবেন প্রফেসর আনাতলি?

কি করে করা যায় বলো তো? আচ্ছা এক কাজ করলে তো হয়। কাউন্ট নাকি ইউরোপের সব রাজসভায় যেত, তা যদি হয় তাহলে জারের আমলে কি আর ক্রেমলিনে আসেন নি? আমরা ক্রেমলিন সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করব।

তা করা যেতে পারে। আমিও গল্পচ্ছলে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

কাউন্ট যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ধূর্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি সাউণ্ড প্রুফ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আগে ঘরখানা উত্তমরূপে সার্চ করলেন, দেখলেন কোথাও আড়িপাতা যন্ত্র লুকনো আছে কি না। উনি কিছু ক্রিয়া প্রক্রিয়া করবেন তার যেন কোনো রকম অভাস ইঙ্গিত এরা না পায়।

তিনি হয়তো ঘর সার্চ করতেন না কিন্তু সেদিন লাঞ্চের সময় এখানকার বিজ্ঞানীরা গল্পচ্ছলে ওঁকে নানারকম প্রশ্ন করছিল। কাউন্টের ধারণা হলো যে এরা তাঁকে সন্দেহ করছে। আসল লোক কি না এ বিষয়ে এদের সন্দেহ আছে। তবে ওরা ওঁকে ঘায়েল করতে পারে নি।

এরা যদি ওঁকে সন্দেহ করে তাহলে তিনিও ওদের সন্দেহ করতে পারেন। তাই তিনি ঘরখানা উত্তমরূপে দেখে নিলেন। ঘরখানা সাউণ্ড প্রুফ কি না সেটা একবার যাচাই করে নেওয়া উচিত।

তিনি সঙ্গে যে হ্যাণ্ডব্যাগ এনেছিলেন সেটা খুলে ভেতর থেকে একটা পকেট ট্রানজিস্টর রেডিও বার করলেন। সেটা চালু করে দিলেন। সুন্দর অর্কেস্ট্রা বাজছে। বাজুক।

কাউন্ট দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাইরে কোনো আওয়াজই আসছে না। দরজায় কান চেপে ধরলেন। তবুও কোনো আওয়াজ পেলেন না। তিনি এবার সন্তুষ্ট হয়ে ঘরে ঢুকলেন।

ঘরে ঢুকে পকেট থেকে একটা অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক মিটার বার করে পাশে ছোট্ট সুইচ টিপে সেটাকে চালু করে সারা ঘরটা কয়েকবার পায়চারি করলেন। তারপর মিটার বন্ধ করে পকেটে রাখলেন। কি দেখলেন তিনিই জানেন।

দশ মিনিট পরে চেয়ারে বসে ব্যাগ খুলে একটা পুরু কাগজের খাম বার করলেন। খামের ভেতর থেকে আসল পার্চমেন্ট কাগজে হাতে লেখা একটা ছক বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন খুব সাবধানে। কাগজখানি যেন খুব মূল্যবান কোনো সম্পদ, সামান্যতম আঘাতে বা জোরে বাতাস বইলেও সেটি নষ্ট হয়ে যাবে।

পার্চমেন্টের ওপর দিকে পাশাপাশি অনেকগুলি সংখ্যা, তার নিচে পাশাপাশি তিনটি ছক এবং তার নিচে ঘোর কালো কালিতে এক সার এবং টকটকে লাল কালিতে আর এক সার এইভাবে ষোলো সার লেখা আছে।

কিন্তু কি লেখা আছে? ঐ ছক যদি চুরি যায় তাহলে চোরের কোনো কাজে লাগবে না যদি না সে প্রাচীন তিব্বতী ভাষা জানে। হ্যাঁ ছকটি আগাগোড়া প্রাচীন তিব্বতী হরফে ও তিব্বতী ভাষায় লেখা।

সেই ছকখানি টেবিলে রেখে পাশে আর একখানা সাদা কাগজ রাখলেন তারপর ছকের ওপর ডান হাত রেখে আর বাঁ হাত কনুই মুড়ে বিশেষ এক প্রকার মুদ্রা রচনা করে চোখ বুজে প্রার্থনা করলেন।

তারপর সাদা কাগজখানির ওপর ডান হাত রেখে চোখ বুজে আবার সেই ভাবে প্রার্থনা করলেন। এবার অপর পকেট থেকে একটি বেশ বড় অষ্টমুখী রুদ্রাক্ষ রাখলেন।

তারপর ব্যাগ থেকে পাতলা একটি রেশমী চাদর বার করে গলায় রাখলেন। এইবার উঠে দাঁড়িয়ে আইভানের কাঁচের আধারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ঢাকা তুলে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নামিয়ে রাখলেন।

পকেট থেকে লেনস বার করে আইভানের হাতের রেখাগুলি দেখলেন। তারপর হাতে আটলানটিসের বৃত্তাকার সেই প্রতীক চিহ্নটিও দেখলেন। লোকটা যে সত্যিই আটলানটিসের সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন কিন্তু লোকটার নাম কি? নামটা না জানতে পারলে সবই ব্যর্থ হবে। নামটা জানা খুবই জরুরী।

খুঁজতে খুঁজতে অপর হাতে নামটা পেলেন। অস্পষ্ট হয়ে এলেও নামটা পড়তে পারলেন, হোবিট। কে এই হোবিট? আটলানটিসের সৈনিক? মন্ত্রী? কবি?

পকেট ওয়াচ বার করে সময় দেখলেন। হ্যাঁ সময় হয়েছে।

কাউন্ট আবার টেবিলে ফিরে এসে চেয়ারে বসে আবার সেই পার্চমেন্ট কাগজের ওপর ডান হাত রেখে বাঁ হাতের কনুই মুড়ে সেই কাগজে যা লেখা ছিল তা অনুচ্চ কণ্ঠে পড়তে আরম্ভ করলেন। পর পর সাতবার পড়লেন। সাতবার পড়াই নিয়ম। সাড়া না পেলে আরও সাতবার। যতক্ষণ না সাড়া পাওয়া যায় ততক্ষণ আবার সাতবার করে পড়তে হবে।

একবার, দু'বার, তিনবার এমনি করে সাতবার পড়লেন। কোনো সাড়া নেই। কাউন্ট চিন্তিত এবং শংকিতই। শীতেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠতে লাগল।

এই পরীক্ষা তিনি আগেও কয়েকবার করেছেন কিন্তু সাতবার পড়তে না পড়তেই সাড়া পাওয়া যায় কিন্তু এবার সাড়া পাচ্ছেন না। জানতেন বিলম্ব হবে কারণ প্রেতাত্মা অতি প্রাচীন। কোথায় কোন্ স্তরে আছে তাও জানা নেই।

তিনি আবার পড়তে আরম্ভ করলেন। প্রেতাত্মা নামানো বিদ্যা কাউন্ট তিব্বতে এক প্রাচীন মঠে শিখেছিলেন। তিব্বতী গুরু বলেছিলেন এই মন্ত্র অব্যর্থ, যত প্রাচীন আত্মাই হোক সে ঠিক সাড়া দেবে তবে তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করবে কিনা তা নির্ভর করবে সেই আত্মার প্রকৃতির ওপর।

কাউন্ট ধৈর্য হারালেন না। ভাগ্যক্রমে পার্চমেন্টে লেখা মন্ত্র দীর্ঘ নয়। প্রায় দু' ঘণ্টা পরে সাদা কাগজের ওপর রাখা রুদ্রাক্ষটি নড়ে উঠলো। কাউন্টের মুখে হাসি ফুটল। তিনি প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় প্রশ্ন করলেন "হোবিট তুমি এসেছ ?"

রুদ্রাক্ষ আবার নড়ে উঠলো। কাউন্ট আবার বললেন, তুমি কি আমার ভাষা বুঝতে পারছ ? যদি বুঝতে পেরে থাক তাহলে এই সাদা কাগজের ওপর তোমার নাম লেখ।

সাদা কাগজের ওপর কালো অক্ষর ফুটে উঠলো। এ কোন্ লিপি ? এই রকম লিপি তিনি দেখেছিলেন বাহামা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত এলুথেরা দ্বীপে এক স্থানীয় ধর্মযাজকের গৃহে। তাঁর কাছে ঐ রকম লিপিতে লেখা একটা পুঁথি ছিল। পুঁথিখানা তিনি চেয়েছিলেন কিন্তু ধর্মযাজক দেন নি তবু কাউন্টের বিশেষ অনুরোধে একটি মাত্র পৃষ্ঠার ফটো তুলতে দিয়েছিলেন। সেই ফটো কপি তাঁর লাইব্রেরিতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

কাউন্ট প্রশ্ন করলেন, হোবিট তোমার পোশাকের সঙ্গে যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার লিপির সঙ্গে এই লিপির তো মিল নেই।

কাগজে লেখা উঠলো, কাঠকয়লা পুড়িয়ে ছাই তৈরি করবে, সেই ছাই পাণ্ডুলিপির ওপর আলতোভাবে বুলিয়ে দেবে তাহলেই দেখবে পড়া যাচ্ছে।

বেশ তাই হবে, তাই করব।

এখন তাহলে বলো হোবিট তোমার ঐ পাণ্ডুলিপিতে কি লেখা আছে, তুমি কে ? তোমার পুরো ইতিহাস আমি জানতে চাই।

কাগজে আবার লেখা উঠলো, আজ আমাকে ছেড়ে দাও, আমার সহ্য হচ্ছে না এই পরিবেশ, আবার কাল…।

রুদ্রাক্ষটি আবার নড়ে উঠলো। কাউন্ট বুঝল হোবিটের প্রেতাত্মা ঘর থেকে চলে গেছে। তিব্বতী কাগজে এমন মন্ত্রও লেখা ছিল যার সাহায্যে কাউন্ট হোবিটের প্রেতাত্মাকে আটকে রাখতে পারতেন কিন্তু সে মন্ত্র কেবলমাত্র দুষ্ট প্রেতাত্মাদের প্রতি প্রযোজ্য। কাউন্ট বুঝলেন সহানুভূতি ব্যতীত হোবিটকে বশ করা যাবে না। ধৈর্য ধরতে হবে।

কাউন্ট সারা সকাল ও দুপুর নিজের বাংলোয় বসে কিছু লেখেন বা বই পড়েন। কারও সঙ্গে দেখা করেন না। বিকেলে ইনস্টিটিউটে আসেন। সকলের সঙ্গে চা খান, গল্পগুজব করেন, সন্ধ্যা হলেই সাউণ্ড প্রুফ ঘরে চলে যান।

একদিন প্রফেসর আনাতলি সাহস করে জিজ্ঞাসা করলেন : কাউন্ট আমরা তো নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছি, আমাদের কি কিছু করবার নেই? আপনিই বা কি করবেন এখনও সেসব তো জানালেন না, আমাদেরও তো ওপরওয়ালা আছে এবং তাঁরা বেশ কড়া…।

কাউন্ট কথা শেষ করতে দিলেন না, বললেন আমি সব জানি। আর আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমার কাজ সম্পূর্ণ করে দেব, আমারও এখানে বেশিদিন থাকবার উপায় নেই, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

তবুও আমরা যদি আপনার কাজে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি।

আনাতলির কথা শুনে কাউন্ট কিছুক্ষণ কি ভাবলেন তারপর বললেন : বেশ, আপনারা ইতিমধ্যে একটা কাজ করতে পারেন।

কি কাজ বলুন?

মাছ নামে পরিচিত আপনারা ইলেকট্রিক ইল-এর কথা নিশ্চয় জানেন, ইউরোপের অনেক নদী, জলা জায়গায় বা বিলে দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রেও প্রচুর আছে, শুনেছেন নিশ্চয়।

কিন্তু আটলানটিসের সঙ্গে ইল-এর সম্পর্ক কি?

বলছি, আটলানটিস সম্বন্ধে নাকি কোনোও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি, অবশ্য আইভানের ডেডবডি ছাড়া। অতএব মানুষ আটলানটিসের বিষয় সেদিন পর্যন্ত সব ভুলে ছিল, ভোলে নি এই ইল-এর ঝাঁক, তারা তাদের

বহু যুগের পুরনো অভ্যাস ভুলতে পারে নি। এ এক বিরাট রহস্য। ইল-এর ঝাঁক তাদের জীবনে ঐ বিশাল আটলানটিক দু'বার অতিক্রম করে জানেন কি ?

আনাতলি বলল, ব্যাপারটা সঠিক জানি না তবে এ বিষয়ে কিছু শুনেছি।

কাউণ্ট বললেন তাহলে শুনুন, পেলিওনটোলজিস্টরা বলেন পৃথিবীতে ক্রিটেসিয়ম যুগে এই ইল-দের উৎপত্তি। ইউরোপের ইল দের একটা রহস্য আছে যার সঙ্গে আটলানটিসের একটা সম্পর্ক আছে বলে অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন। এদের এমন একটা অভ্যাস আছে যার কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না অথচ এরা জীবন বিপন্ন করে এ কাজ করে আসছে বছরের পর বছর। এ কাজ করতে করতে এরা হয়তো একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে তবুও পুরুষানুক্রমে এই অভ্যাস ছাড়তে পারছে না। আগেই বলেছি এরা আটলান্টিক সমুদ্র দু' বার অতিক্রম করে, একবার সদ্য ডিম ফোটা লার্ভা বা শূককীট অবস্থায় আর একবার প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় যখন এরা আবার ডিম পাড়বার যোগ্য হয়। জীবনে যেন এদের একটিমাত্র কাজ, বাচ্চার জন্ম দেওয়া, আর কোনো কাজ নেই যেন। অথচ এজন্যে ওদের কত বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। সামুদ্রিক প্রাণীরা ওদের প্রধান শত্রু, তারপর সমুদ্রের বেহিসেবী মেজাজ ইত্যাদি তো আছেই। শেষ পর্যন্ত এরা হয়তো আটলানটিক সমুদ্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই বিজ্ঞানীরা ইল-রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করছেন কিন্তু অ্যারিস্টটল স্বয়ং যদি প্লেটো বর্ণিত আটলানটিস বাতিল না করতেন তাহলে তিনি নিজেই হয়তো এই রহস্য ভেদ করতে পারতেন।

ইল-দের আর একটা রহস্য। ইউরোপের নদীগুলিতে, আবার সব নদী নয়, যেসব নদী আটলানটিক সমুদ্রে পড়েছে, সেইসব নদীতে শুধু মেয়ে ইল পাওয়া যায়, পুরুষ ইল নয়।

কাউণ্ট বলতে লাগলেন, সারগাসো সি-এর নাম আপনারা নিশ্চয় জানেন, অ্যাজোরস দ্বীপের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সারগাসো

মানে একপ্রকার লতাজাতীয় জলজ উদ্ভিদ, এক একটি গাছ হাজার ফুট বা তিনশ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এই গাছ এত ঘন ও পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে জন্মায় যে সমুদ্র তরঙ্গ স্তব্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য সমুদ্রও এখানে অগভীর, হাওয়া বাতাসও নেই বললেই চলে। আগেকার যুগের পালতোলা জাহাজ ঝড়ের বেগে যদি এই সমুদ্রে ঢুকে পড়ত তাহলে তার আর নিস্তার ছিল না। অগভীর জলে আটকে যেত এবং অচিরে ঐ সারগাসো লতা জাহাজটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরত।

বিজ্ঞানীরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে জানতে পেরেছেন যে এই সারগাসো সি হলো ইলদের আড্ডা। ইল আছে দু রকম, আমেরিকান ইল এবং ইউরোপিয়ান ইল। সারগাসো সি-এর পশ্চিম দিকে আমেরিকান ইল এবং পুব দিকে ইউরোপিয়ান ইলরা স্ত্রী ইলদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোলে এবং সেই ক্ষুদে বাচ্চার আকার যখন বড়জোর একটা দেশলাই কাঠির সমান তখনই তাদের ভ্রমণের নেশায় পেয়ে বসে।

জলজ লতার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওরা গালফ স্ট্রিম নামে সেই বিখ্যাত উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোতে ভাসতে ভাসতে ইউরোপের দিকে যায়। ইউরোপের নদীমুখগুলিতে পৌঁছতে ওদের সময় লাগে তিন বছর। ইতিমধ্যে দলের অনেক বাচ্চার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, অনেক মাছ সামুদ্রিক প্রাণীর পেট ভরিয়েছে, যারা বড় হয়েছে তারা এই সময়ের মধ্যে বেশ বড়-সড় হয়েছে, সাপের মতো কিলবিল করে, রং ঠিক সবুজ নয় আবার বাদামীও নয়, মাঝামাঝি একটা রং। নদীমুখে এসে এই ইলের ঝাঁক দু' দলে ভাগ হয়ে যায়। পুরুষ ইলরা সমুদ্রেই থেকে যায় আর মেয়ে ইলরা ইউরোপের নদীতে ঢুকে যায় যেন বাপের বাড়ি গেল আর পুরুষরা চাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সন্ধানে সমুদ্রে পাড়ি জমাবে।

এরপর দু'বছর বিরহ যাপন। পাঁচ বছর বয়স হলেই স্ত্রী-পুরুষ মিলন ক্ষমতা অর্জন করে। পাঁচ বছর বয়স হলেই পুরুষ ইলরা নদীমুখে এসে অপেক্ষা করে তারপর দুজনে একত্রে প্রবেশ করে সারগাসোর নিভৃত লতার অরণ্যে

যেখানে তাদের মিলন হয়।

এ এক বিরাট রহস্য। মেয়ে ইলরা তাদের পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে সমুদ্রে থাকে না কেন? নদীর স্বাদু জল ব্যতীত কি তারা বাচ্ছার জন্ম দেবার জন্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না?

অনেকে মনে করছেন যে বর্তমানে যেখানে অ্যাজরোস দ্বীপ ও সাবগাসো সি-এর অবস্থান, ইল মাছদের সেইখানেই কোথাও ছিল তাদের জন্মভূমি আর সেইখানেই ছিল প্রাচীন আটলানটিস আর আটলানটিসের নদীতে মেয়ে ইলের ঝাঁক পূর্ণতা লাভ করত। কিন্তু আটলানটিস ডুবে গেছে, ইল তাদের পুরনো অভ্যাস ছাড়তে পারে নি, তাই তাদের সমুদ্র যাত্রা, ইউরোপের নদীতে যাওয়া আসা।

আটলানটিস ডুবে গেল আর সেই সঙ্গে গালফ স্ট্রিমেরও গতিপথ বদলে গেল আর গালফ স্ট্রিমের গতিপথে ইলরাও বিচরণ আরম্ভ করল। এ এক বিরাট রহস্য। চেষ্টা করে দেখুন না, আমি যা বললুম তা ঠিক কিনা।

আমাদের মধ্যে ভ্লাডিমার ইল নিয়ে কিছুদিন কাজ করেছিল অবশ্য এই ব্যাপারটা নিয়ে নয়। ইলদের দেহে তড়িৎ শক্তির অবস্থান নিয়ে সে কিছু কাজ করেছিল। ভ্লাডিমার ইল নিয়ে নতুন করে আবার কাজে নামবে নাকি, আনাতলি বললেন।

ভালই বলেছেন। আমাদের এই কাজটা শেষ হয়ে গেলে ইলদের নিয়ে আবার নতুন করে কাজে নামা যাবে।

হঠাৎ ঘড়ি দেখে কাউন্ট যেন চমকে উঠলেন। বললেন, আমার দেরি হয়ে গেছে আবার কাল সন্ধ্যায় কাজ হবে। শুনুন আপনাদের একটা কথা বলে রাখি আমি যখন সাউণ্ড প্রুফ ঘরে কাজ করব তখন আপনারা কেউ দয়া করে আমাকে ডাকবেন না।

আমরা তো ডাকি না।

জানি, আমি আজ থেকে একটা জটিল ব্যাপারে আটকে থাকব, বাধা পড়লে সব ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে তাই এই অনুরোধ তবে আমার কাজের আর বেশি বাকি নেই, বড়জোর আর সাত দিন।

আমার অনুরোধটা একটু মনে রাখবেন।

একে একে ছ'টি দিন কেটে গেল। সপ্তম দিনে সন্ধ্যার পর এক কাণ্ড ঘটল। কাউন্ট অন্যান্যদের সঙ্গে চা পান করে একত্রে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে সন্ধ্যা হতেই সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে চলে গেছেন। এমন সময় টোমস্ক ইনস্টিটিউটে কেজিবি-এর চেয়ারম্যান এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি এসে হাজির।

তাঁরা এসেই বললেন যে তাঁরা এখনি কাউন্ট সিনজার্মেনের সঙ্গে দেখা করতে চান, জরুরী দরকার আছে।

আনাতলি বললেন, কাউন্ট অনুরোধ করেছেন যে সন্ধ্যার পর তিনি যখন সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে কাজ করবেন তখন তাঁকে যেন বিরক্ত না করা হয়। আজই বোধহয় কাউন্টের কাজ শেষ হবে। এই দিন পর্যন্ত তাঁকে যেন ডাকা না হয়।

কেজিবি চেয়ারম্যান বললেন, কিন্তু আমরা যে আজই ফিরে যাব।

আজই ফিরে যাবেন? ডিনার খেয়ে যাবেন তো? ততক্ষণে কাউন্ট বোধহয় নিচে নেমে আসবেন।

না আমরা ডিনার খাব না, আমাদের তাড়াতাড়ি আছে, আজ তো সপ্তম দিন? তাই বললে না? তাহলে এতক্ষণে কাউন্টের কাজ শেষ হয়ে গেছে, তুমি ডাক।

আনাতলি ও সঙ্গীরা ভেবে দেখলেন যে কেজিবি-কে কোনো রকমে অসন্তুষ্ট করা যায় না, কেজিবি তাদের দেশের প্রতিষ্ঠান বরঞ্চ কাউন্ট বিদেশী। কাউন্ট অসন্তুষ্ট হলে কিছু যায় আসে না, না হয় দু'টো কথা শুনতে হবে।

আনাতলি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে ওপরে উঠলেন এবং সাউণ্ডপ্রুফ ঘরের দরজায় নক করলেন। কোনো সাড়া নেই। আনাতলি আবার নক করলেন, এবার আর একটু জোরে। এবারও কোনো সাড়া নেই। কাউন্ট ভেতরে কি করছেন জানা যাচ্ছে না। আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে আনাতলি আরো জোরে এবং দু' হাত দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলেন। তবুও দরজা

খুলল না।

এদিকে দেরি হচ্ছে দেখে কেজিবি-এর চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারি ওপরে উঠে এসে আনাতলিকে জিজ্ঞাসা করলেন :

কি লোকটা দরজা খোলে নি ? খুলবে না জানি, ওটা একটা জোচ্চোর, ইম্পস্টার, ঠগ্ বলতে বলতে চেয়ারম্যান বন্ধ দরজায় সজোরে দু' বার লাথি মারলেন।

এক মিনিট পরে দরজা খুলে গেল। কাউন্ট সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বাইরে অপেক্ষমান তিনজনের দিকে এমনভাবে চাইলেন যে তারা সম্মোহিত হয়ে গেল। কারও মুখে কোনো কথা তো নেই এমন কি হাত তুলে কাউন্টকে বাধা দিতেও ভুলে গেলেন। তারা অসহায়ভাবে দেখলেন তাঁদের সামনে দিয়ে কাউন্ট নিচে নেমে গেলেন।

সম্বিৎ ফিরে আসতেই তিনজনে আগে সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে ঢুকলেন। ঘর ফাঁকা। আইভানের দেহ যে অবস্থায় রাখা ছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে, টেবিল ও চেয়ার দুটোই ঠিক আছে। ঘরে আর কিছু নেই। একটা কাগজের টুকরো কিংবা পোড়া দেশলাই কাঠি বা কোনো কিছুই নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে ওঁরা দ্রুত নিচে নেমে এলেন। তখনি ছুটলেন কাউন্টের বাংলোর দিকে। বাংলোয় পৌঁছে দেখলেন দরজা খোলা। ঘরে ঢুকে দেখলেন ঘর শূন্য। কাউন্টের বড় চামড়ার ব্যাগটাও নেই।

কেজিবি চেয়ারম্যান বললেন, ব্যাটা পালিয়েছে, তোমরা ওকে কত টাকা দিয়েছ ?

এক পয়সাও নয়, এমন কি সাউথ আমেরিকা থেকে এখানে আসবার প্লেন ভাড়াও নেন নি।

তাহলে তো বাঁচা গেছে, ব্যাটা একটা বড় দাঁও মারবার তালে ছিল বোধহয়, খুব বেঁচে গেছি, কিন্তু পালাবে কোথায় ?

কেজিবি চেয়ারম্যান টেলিফোন করে টোমস্ক এয়ারস্ট্রিপ, রেলওয়ে স্টেশন, বাসস্ট্যাণ্ড এবং চেকপোস্টের সমস্ত সিকিউরিটি গার্ডদের সতর্ক করে দিলেন। তাদের বলে দেওয়া হলো লোকটিকে দেখতে পেলে যেন এখানে

ধরে আনা হয়।

দু ঘণ্টা পার হয়ে গেল। কাউন্টের কোনো খবর নেই এবং এক মাসের মধ্যে কাউন্টের কোনোই খবর পাওয়া গেল না। তুচুপিটাতেও খবর নেওয়া হলো। না, কাউন্ট সেখানে ফিরে যান নি। লোকটা গেল কোথায়? সেদিন রাত্রে টোমস্ক থেকে বেরোল কোন্ পথে?

আনাতলি ভাবলেন বৃথা তাঁদের কিছু সময় নষ্ট হলো তবে তাঁদের কোনো সামগ্রী খোয়া যায় নি। প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপির ফটো কপিগুলি শুধু গেছে। মূল পাণ্ডুলিপি তাঁদের কাছে আছে। কিন্তু লোকটাকে ঠগ্ বলে আনাতলিরা বিশ্বাস করতে পারছেন না। গল্পগুজবের ছলে তাঁরা তাঁকে যাচাই করে নিয়েছেন। তাঁদের মতে কাউন্ট একজন খাঁটি মানুষ এবং নানা বিদ্যা তাঁর জানা আছে, পড়াশোনাও করেছেন প্রচুর। লোকটি স্বয়ং সিনজার্মেন না হতে পারে কিন্তু বাজে লোক নয়। এখন আর কিছু করার নেই, যা করবার নিজেদেরই করতে হবে।

এরপর একমাস কেটে গেল। যেদিন তিরিশ দিন পূর্ণ হলো সেদিন প্রফেসর আনাতলি ইনস্টিটিউটে নিজের ঘরে ঢুকে দেখলেন তাঁর টেবিলে একটা প্যাকেট রাখা রয়েছে। ব্রাউন পেপারে প্যাক করা সুতো দিয়ে বাঁধা। ওপরে লেবেলে প্রফেসর আনাতলির নাম লেখা, তার নিচে লেখা আছে টোমস্ক ইনস্টিটিউট, টোমস্ক, ইউ এস এস আর।

প্রফেসর আনাতলি প্যাকেটটা কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারলেন না কারণ প্রেরকের নাম লেখা নেই। তিনি তাঁর সেক্রেটারি এবং আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু প্যাকেটটা কোথা থেকে এসেছে, কে দিয়ে গেছে কেউ বলতে পারল না।

প্রফেসর আনাতলি প্যাকেটটা খুললেন। টাইপ করা একখানা পাণ্ডুলিপি। কি ব্যাপার? পাণ্ডুলিপি কে পাঠাল। এই যে সঙ্গে টাইপ করা একখানা চিঠিও রয়েছে। চিঠির নিচে নাম দেখলেন, কাউন্ট সেণ্ট জার্মেন, টাইপ করা, নিজের হাতে সই করেন নি। তিনি আগেও একখানা চিঠি লিখেছিলেন, তাতেও স্বাক্ষর করেন নি।

কাউন্ট সিনজার্মেন লিখেছেন : সাউথ পোলে তোমরা আটলানটিসের যে যুবকটিকে খুঁজে পেয়েছিলে, যার তোমরা নাম দিয়েছ আইভান তার আসল নাম হোবিট, ওর হাতেই নামটা লেখা আছে তবে সে অক্ষর তোমরা হয়তো পড়তে পারবে না।

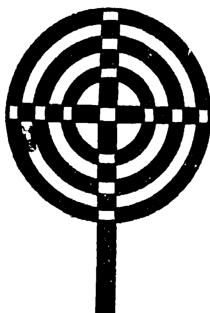
তোমরা আমাকে প্যাপিরাসের যে পুঁথিগুলো দিয়েছিলে, প্রকৃতির রুক্ষ অত্যাচারে সেগুলো প্রায় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হোবিট আমাকে একটা উপায় বলে দিয়েছিল সেই উপায় অবলম্বন করে পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি। তারপর তিব্বতে আমার গুরুর কাছে শেখা বিদ্যা প্রয়োগ করে আমি হোবিটের আত্মাকে তোমাদের ইনস্টিটিউটের ঘরে আনতে পেরেছিলুম।

হোবিট ছিল প্রাচীন আটলানটিসের রাজকবি। সে একটা কাব্য লিখেছিল। হোবিটের মুখ থেকে শুনে আমি সেই কাব্য গদ্যে অনুবাদ করে পাঠালুম। হোবিটই বলেছিল পাণ্ডুলিপি পড়তে দেরি হবে, তার চেয়ে কাহিনীটা আমি নিজেই বলছি তুমি লিখে নাও পরে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো। আমি তাই করেছি।

হোবিট আমাকে বলে গেছে আটলানটিস যেদিন ধ্বংস হলো সেদিন পাণ্ডুলিপিখানা সে তার জামার ভেতরের পকেটে রেখেছিল। সমুদ্রে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়েছিল। সে জানতে পারে নি কোথায় সে ভেসে গিয়েছিল। তারপর হোবিটের প্রেতাত্মা আমার কাছে অনুরোধ করেছিল যে ভাবে পারি আমি যেন তার মুক্তির ব্যবস্থা করি। তার মুক্তির ব্যবস্থা করতেই আমি সেইদিন রাত্রেই তিব্বতের পথে যাত্রা করেছিলুম। কি ভাবে গিয়েছিলুম সে কথা আমি তোমাদের বলতে পারব না।

তোমরা আমাকে এখন কিছুদিন খুঁজে পাবে না। আমার পেনসন কোথায় পাঠাতে হবে তা আমি তোমাদের পরে জানাব। প্যাকেটটা তোমার টেবিলে কি করে পৌঁছল তা জেনে লাভ কি? সম্পত্তিটা তোমাদেরই, তোমাদের কাজে লাগবে, তোমরা হয়তো প্রমাণ করতে পারবে আটলানটিসের একটা গোটা মানুষ আবিষ্কার অতএব প্লেটোর কল্পনা নয়, আট-

লানটিস নামে একটা দেশ ছিল। তার প্রমাণ হোবিট তার পাণ্ডুলিপি আর তার রচিত কাব্য।



আটলানটিসের রাজধানী আটলানটা। প্রাসাদে রাজা মৃত্যুশয্যায়। রাজার বয়স দুশো বছর। রাজার দুই পাশে তাঁর দুই কন্যা। রাজার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠছে, বড় মেয়ে নরম রুমাল দিয়ে সেই ঘাম মুছে দিচ্ছে।

রাজার বয়স যে দুশো বছর হয়েছে তা তাঁর চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই। যেহেতু আটলানটিসে দুশো বছরের বেশি কেউ বাঁচতে পারে না তাই আজ পৃথিবীতে তাঁর শেষ দিন। তাঁর গলায় সোনার হার। হারে একটি রত্নের লকেট। সেই রত্ন থেকে সাত রকম রং ঠিকরে পড়ছে। এ রত্ন দুষ্প্রাপ্য। এই রত্নের প্রভাবে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের মনেও সাহস সঞ্চারিত হয়।

রাজা জানতেন যে আজই তাঁর মৃত্যু হবে তাই তিনি বড় মেয়েকে শেষ উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। রাজা ইতিমধ্যে কয়েকবার পুনর্নব প্রকোষ্ঠে কিছু-কাল কাটিয়ে তাঁর আয়ু বাড়িয়ে নিয়েছেন।

কোনো জরুরী কারণ বিনা পুনর্নব প্রকোষ্ঠে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, রাজা হলেও নয়। পর পর কয়েকবার বিয়ে করা সত্ত্বেও রাজার কোনো সন্তান অর্থাৎ সিংহাসনের উত্তরাধিকার না জন্মানো পর্যন্ত তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারছিলেন না।

অবশেষে তাঁর একটি কন্যা জন্মায়। কন্যাকে তিনি পুত্রের মতনই লালন

করলেন, রাজকার্য চালাতে যত রকম বিদ্যার প্রয়োজন সবই শেখালেন। কন্যা যৌবনবতী হলো। সিংহাসনের ভার নেবার উপযুক্ত হলো, রাজারও বয়স দুশো বছর হলো। এবার রাজা পরলোকে নিশ্চিন্তে যেতে পারবেন।

দুই কন্যা ছাড়া একজন চিকিৎসকও হাজির আছেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী একদিকে বসে আছেন। অন্যান্য দু' একজন আছেন। দূরে ক্রীতদাস ক্রীতদাসীরা আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

বড় মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী; নাম আভিতা। দেহের প্রতিটি অঙ্গ যেন কোনো নিপুণ শিল্পী মেপে নিখুঁতভাবে তৈরি করেছে। মাথার চুল সোনালী, গায়ের রংও সোনালী। এমন সুন্দরী কন্যা সহসা দেখা যায় না।

ছোট মেয়ের নাম তারিতা। তারিতার দেহসৌষ্ঠব নিখুঁত কিন্তু দিদির মতো সুন্দরী নয়। তার মাথার চুল লাল, গায়ের রং দিদির মতো নয় তবে ফর্সা বলা চলে। দিদির মতো সুন্দরী হয় নি কারণ তারিতা অন্য মায়ের সন্তান।

রাজার নাম পার্টন। রাজা বড় মেয়ে আভিতাকে উদ্দেশ করে বললেন, আভিতা তুমি তো বুঝতেই পারছ আমার আয়ু শেষ হয়েছে আর অল্প সময়ের মধ্যেই আমি বিদায় নোব। আমার এই রাজত্ব যা সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত তিন হাজার মাইল চওড়া আর উত্তরে তুষারদেশ থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত চার হাজার মাইল, এখন থেকে তুমি এর রাণী. সম্রাজ্ঞী।

আভিতা কিছু বলল না। তার চোখ ছলছল করছে। ছোট বোন তো বাবার পাশে একটা বালিশে মুখ রেখে অনেকক্ষণ থেকে কাঁদছে।

রাজা পার্টন বলতে লাগলেন, সবই তো তোমাকে শিখিয়েছি, নতুন কিছু বলবার নেই, কি করে দেশ শাসন করতে হয় তাও তুমি উত্তমরূপে জান, মাঝে মাঝে আমি তোমার হাতে শাসনভার ছেড়ে দিয়ে ভ্রমণে গিয়েছি, ফিরে এসে তোমার কোনো ত্রুটি পাই নি।

একটু দম নিয়ে বললেন, আমার একটা দুঃখ রয়ে গেল। আমি আমার এই দুশো বছর শাসনে দেশকে আরও উন্নত করতে পারি নি বরঞ্চ বর্তমানে আমাদের গৌরব বলতে কিছু নেই। তার কারণ আমি কড়া হাতে দেশ

শাসন করতে চাই নি আমি ভালবাসা দিয়ে প্রজাপালন করতে চেয়েছিলুম, ফল হয়েছে বিপরীত। আটলানটিসবাসীরা উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছে। তুমি নারী, তোমাকে তোমার স্বভাবসুলভ কোমলতা ভুলে কঠোর হস্তে শাসন করতে হবে নইলে এ দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। দেশের লোক এখন আর পরিশ্রম করতে চায় না। আদেশ পালন করতে চায় না। সুখ সুবিধা বাড়ালে আরও দাবি করে কিন্তু কাজের পরিমাণ কমে যায়।

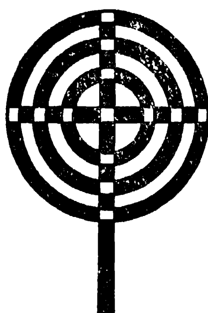
আর একটি কথা। পরমাণু বাণ ব্যবহার কোরো না। পরমাণু শক্তি ব্যবহার কর কিন্তু বাণ নয়। আমাদের শত্রুরও ঐ বাণ আছে, তাহলে তারাও ঐ অস্ত্র আমাদের ওপর প্রয়োগ করবে। উত্তর দেশ সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকবে। ওরা আমাদের শত্রু যদিও সদ্ভাব দেখায়, কিন্তু সুযোগ পেলেই আমাদের বিপদে ফেলবে। ও দেশের রাজার বয়স কম হলেও সাহসী এবং কূটনীতিতে অভিজ্ঞ।

মেয়ের মুখের দিয়ে চেয়ে বললেন, পুনর্নব প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কোরো না। ঐ প্রকোষ্ঠে মেয়েদের প্রবেশ করা উচিত নয় যদি প্রয়োজন বোধ কর একবারের বেশি নয়। আমার আরও একটি অনুরোধ, তুমি নিশ্চয় বিবাহ করতে চাইবে কিন্তু বিবাহ করে ক্রীতদাসী হোয়ো না, বরঞ্চ প্রেমিক রেখো কিন্তু বিবাহ তোমার জন্যে নয়। এই আমার শেষ কথা। ছোট বোনকে দেখো। আশীর্বাদ করি তোমাদের ভালো হোক, তোমরা ভালো থাক।

কথা শেষ করে রাজা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা আলগা হয়ে বালিশের এক দিকে ঢলে পড়ল। চিকিৎসক দ্রুত কাছে এসে রাজার কব্জি স্পর্শ করে বলল, রাজা আর নেই। সম্রাজ্ঞী আভিতা তুমি দীর্ঘজীবি হও।

আভিতা এতক্ষণ কান্না রোধ করে ছিল, এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। প্রাসাদের বাইরে বিশাল জনতা অপেক্ষা করছিল। প্রধান মন্ত্রী মাহাশান বাইরে এসে প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন রাজা পার্টন পরলোক গমন করেছেন। তাঁর কন্যা আভিতা, সম্রাজ্ঞী আভিতা আটলানটিসের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। জয় সম্রাজ্ঞী আভিতার জয়।

বিশাল জনতা উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিলো, সম্রাজ্ঞী আভিতার জয়।



কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। আভিতা আটলানটিসের সিংহাসনে বসেছে। প্রথম দিন থেকেই সে কড়া হাতে দেশ শাসন করতে আরম্ভ করেছে। অভিষেকের দিন বারোটি রাজ্যের শাসনকর্তা, প্রধান মন্ত্রী, অন্যান্য প্রতিনিধিরা এবং উত্তরে অবস্থিত কারিয়ল দেশের যুবক রাজা সঙ্গরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। নানা উৎসব নৃত্যগীত প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটা সপ্তাহ সকলেই উপভোগ করেছিল। অনেক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

অভিষেক উৎসব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত দেশটা একবার ঘুরে এলো। দেশের অবস্থা নিজের চোখে দেখল এবং স্থির করল বছরে একবার সে সারা দেশ পরিভ্রমণ করবে।

প্রতিদিন মন্ত্রীসভার অধিবেশন বসে। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে। সাধারণ নাগরিকদের জন্যেও কিছু সময় নির্ধারিত আছে, এই সময়টা সে তাদের মুখ থেকেই তাদের অভাব অভিযোগ শোনে।

রাজকোষে অর্থের অভাব নেই অথচ দেশের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে আছে। লোকবলেরও অভাব নেই। আভিতা সেদিকে মন দিলো। বন্ধ কাজগুলি চালু করল অনেক নতুন কাজেও হাত দিলো।

দেশের শক্তি উৎপাদন কাজ কিছু দিন থেকে ব্যাহত হচ্ছে। শক্তির প্রধান উৎসগুলি হলো সৌরশক্তি, সমুদ্রের জোয়ার থেকে উৎপাদিত শক্তি, ঝর্ণা ও নদীর স্রোত বেঁধে শক্তি উৎপাদন, হাওয়া কল এবং ফসিল শক্তি

যথা কয়লা ও মাটির তেল।

মোট যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন সে পরিমাণ শক্তি কেন উৎপাদিত হচ্ছে না সেজন্যে সে বিজ্ঞানীদের আদেশ দিয়েছে অনুসন্ধান করে এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে।

রাজধানী আটলানটা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। তাকেও নতুন করে সাজাতে হবে। কিছু মন্দির, কিছু উদ্যান, মূর্তি এবং ভালো রাস্তা তৈরি করা দরকার। এছাড়া আরও রঙ্গালয়, পাঠাগার ও ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠ দরকার।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে দেশের লোক যেন দিন দিন অলস হয়ে যাচ্ছে। তারা পরিশ্রম করতে চায় না। সর্বদা বিলাসে ডুবে থাকতে চায়। পুরুষ ও নারী উভয়েরই চরিত্র শিথিল হচ্ছে। তারা প্রকাশ্যে নানারকম অশোভন আচরণ করছে।

ওদিকে উত্তরে কারিয়ল দেশ ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করছে। কারিয়লের রাজা সঙ্গর সুযোগ পেলেই আটলানটিস আক্রমণ করবে।

রাণী আভিতা ঘুম থেকে উঠে চোখ রগড়াচ্ছে। প্রধান মন্ত্রী মাহাশান পাশের ঘরে অপেক্ষা করছে। সভায় যেতে রাণীর কোনোদিন এত দেরি হয় না, আজ এত দেরি হচ্ছে কেন মাহাশান তাই খোঁজ নিতে এসেছে। বৃদ্ধ মাহাশান তার পিতার বন্ধু। আভিতা ও তারিতা তাকে পরিবারের একজন মনে করে। তাই রাজবাড়িতে মাহাশানের অবাধ গতি।

স্বচ্ছ ও ক্ষুদ্র রাত্রিবাসের ওপর একটা বড় ও ঢিলে জামা পরে আভিতা পাশের ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল : কি কাকা কি ব্যাপার ? আপনি যে এত সকালে ?

সকাল আর নেই মা, অনেক বেলা হয়ে গেছে, তাই তো খবর নিতে এলুম।

দেওয়ালে মস্ত বড় একটা ঘড়ি ছিল। সেইদিকে চেয়ে আভিতা বলল, সত্যিই তো অনেক বেলা হয়ে গেছে। কি জানেন কাকা কাল রাত্রে

আমার ঘুম হয় নি, গরমে কষ্ট পেয়েছি, ঘর ঠাণ্ডা রাখার যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে কিন্তু এত বেলা হয়ে গেছে রোদ ওঠে নি কেন?

মাহাশান বলল, রোদ ওঠে নি কেন? বারান্দায় এসে দেখ কি রকম একটা কুয়াশা সারা আটলানটা এবং তার বাইরেও অনেকটা অঞ্চল আবৃত করে রেখেছে। গন্ধকের গন্ধ পাওয়া গেছে। উত্তর দেশ থেকে খবর পেলুম নির্মেঘ আকাশে মেঘ ডাকার আওয়াজ শোনা গেছে, দূরে কোথাও ভূমিকম্প অথবা অগ্ন্যুৎপাৎ হচ্ছে।

উত্তর দেশে? সে তো আমাদের শত্রু রাজ্য। আমাদের ভয় কিসের? আভিতা বলল।

উত্তরের সবটাই তো আর শত্রু রাজ্য নয়। উত্তর-পুব দিকটা তো আমাদের। আচ্ছা কাকা উত্তর দেশের লোকেরা প্রচণ্ড শক্তিশালী কোনো বোমা বানিয়ে তা পরীক্ষা করছে না তো? তুষার পাহাড় যদি গলে যায় আমাদের দেশে প্লাবন হবে।

এখনও সব খবর আমি পাই নি আভিতা। তুমি প্রস্তুত হয়ে রাজসভায় এস আমি বিস্তারিত খবর সংগ্রহের ব্যবস্থা করছি।

কিন্তু কাকা আমরা সন্দেহ করেছিলুম মাউন্ট আটলা বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু সে যদি জেগে ওঠে, অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ করে, কিংবা কারিয়লরা নতুন কোনো শক্তিশালী বোমা তৈরি করে থাকে তাহলে তো চিন্তার কারণ। আপনার মনে আছে দেবীর মন্দিরে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা? বাবা তো তখন ছিলেন।

কি? সেই ভবিষ্যদ্বাণী? দেবী বলেছেন আটলানটিসের ধ্বংস আসন্ন? কিন্তু সেই ভবিষ্যদ্বাণী দেবী স্বয়ং করেছেন না কোনো মানুষ করেছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে আভিতা মা।

কাকা আমার সন্দেহ নেই, আমি নিজের কানে শুনেছি, কোনো মানুষের অমন কণ্ঠস্বর হতে পারে না।

দেবী যদি ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন তবে তা ফলবে কিন্তু তিনি কোনো তারিখ ঘোষণা করেন নি। আমরা যদি তাঁকে তুষ্ট করতে পারি তাহলে

তিনি হয় তো আমাদের ক্ষমা করতে পারেন। তুমি নতুন রাণী হয়েছ, তোমরা নতুন যুগের মানুষ, নতুন তোমাদের চিন্তাধারা, নতুন উদ্যমে কাজে লাগ, প্রজাদের মঙ্গল কর, তাহলেই দেবী সন্তুষ্ট হবেন।
কাকা আমার ইচ্ছে আপনাকে আমি পুনর্নব প্রকোষ্ঠে পাঠাব। আপনি নতুন শক্তি অর্জন করে আসুন…
ও কাজটি কোরো না মা, অনেক দিন বেঁচেছি আর বাঁচতে আমার ইচ্ছে নেই। তুমি তাড়াতাড়ি এস, অনেক দেরি হয়ে গেছে। সকলে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে। আর একটা কথা রাণী, আটলানটা শহরে কিছু বিদেশী এসেছে। তাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে কিন্তু তাদের মতলব বোঝা যাচ্ছে না।
কেন তারা কি কিছু গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে ?
এখনও করে নি কিন্তু তারা আমাদের নিয়মকানুন মেনে চলছে না, যেমন যে অতিথিশালায় ওরা উঠেছে সেখানে ওরা সর্বদা অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দাবি করছে। তারপর আমাদের রাস্তায় আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ, ওদের সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও ওরা মানছে না ; এই রকম আর কি ?
যদি বেশি গোলমাল করে তাহলে কারাগারে পাঠাতে হবে। ঠিক আছে মাহাশান তুমি যাও, আমি এখনি যাচ্ছি।

সভায় এসে আভিতা দেখল সত্যিই সকলে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার বোন তারিতাও এসে গেছে। সভার সব কাজে তারিতাকে হাজির থাকতে হয়। আভিতার তাই আদেশ। সে চায় তারিতা সব শিখুক, সব জানুক, প্রয়োজন হলে তার অনুপস্থিতিতে তারিতা যেন রাজকার্য চালাতে পারে।
আজকের সভায় আভিতা বিশিষ্ট কয়েকজন বিজ্ঞানীকেও আসতে বলেছিল। এই যে কুয়াশা কিংবা উত্তর দেশে ভূকম্পন, এর কারণ জানা দরকার। তাঁদের মতামত শোনবার জন্যেই আভিতা তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

সভায় এসে আভিতা প্রথমে আমন্ত্রিত বিজ্ঞানীদের কাছে ও পরে অন্যান্য-দের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল।

একধারে মলান্টি নামে একজন বিজ্ঞানী গালে হাত দিয়ে বসে কি ভাবছিলেন। ভূতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি পরিচিত। এখন বয়স হয়েছে, মাথার চুল ও দাড়িগোঁফ সব সাদা, ঋষিতুল্য চেহারা। তাঁর বাক্যের সকলে গুরুত্ব দেয়।

আভিতা তাঁকেই প্রথমে প্রশ্ন করল। আভিতা বলল : আপনি আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, আমরা সকলে আপনাকে মান্য করি, আপনার সকল কথার আমরা গুরুত্ব দিই। আপনাকেই আমি প্রথমে জিজ্ঞাসা করি এই কুয়াশার কারণ কি ? আমাদের সকল শক্তি হ্রাস পেয়েছে, সর্বত্র উৎপাদন কমে গেছে এমন কি আমাদের স্ফটিক স্তম্ভগুলিও আগেকার মতো শক্তি বিকিরণ করছে না। কুয়াশার প্রভাবে সৌরশক্তি প্রায় লীন। এসবের কারণ কি ?

মলান্টি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : মা আমি বর্তমানে অবসর নিয়েছি, বিজ্ঞানা-গারে আর যাই না, নতুন কোনো আবিষ্কার বা ঘটনার খবরও রাখি না, আমি আমার পাঠাগারে বসে আত্মজীবনী রচনা করছি, আমি সঠিক কিছু বলতে অক্ষম।

তথাপি আপনার মতামতের মূল্য আছে। শক্তি উৎপাদনের ওপর এই কুয়াশার কোনো প্রভাব আছে কি ? এই কুয়াশা কতদিন থাকতে পারে কিংবা আমরা এই কুয়াশাকে সরিয়ে দিতে পারি কিনা।

দেখ মা মাটির নিচে কি আছে না আছে অথবা মাটির প্রকৃতি ও পরিবর্তন নিয়ে আমার কাজ, তুমি যে প্রশ্ন করেছ তার উত্তর আমি দিতে পারি না তাছাড়া এ বিষয়ে আমি ওয়াকিবহালও নই, বরঞ্চ ভৌতবিদ্যায় পারদর্শী গোলেটাকে জিজ্ঞাসা কর। ওর বয়স কম হলেও রীতিমতো প্রতিভাশালী, আধুনিক বিজ্ঞান এবং রাজনীতিরও খবর রাখে।

আভিতা বলল, গোলেটা মলান্টি যা বললেন, আপনি তো সব শুনলেন এখন আপনি আপনার মতামত জানান।

গোলেটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের উত্তরে যে দেশ যার নাম কারিয়ল তাদের আমরা আমাদের তুল্য উন্নত মনে করি না, না জ্ঞানে না বিজ্ঞানে কিন্তু আমাদের অনুমান ঠিক নয়। আমার অনুমান ওরা যেভাবে হোক পরমাণুবিদ্যা আয়ত্ত করেছে এবং পরমাণু অস্ত্র বানিয়েছে আর সেই অস্ত্র ওরা সমুদ্রের নিচে ফাটিয়েছে যার ফলে আটলানটিসের কোনো কোনো অঞ্চলে মৃদু ভূকম্পন হয়েছিল।

একজন বিজ্ঞানী প্রশ্ন করলেন তাহলে এই কুয়াশার কারণ কিছু অনুমান করেছেন কি ? এবং আমাদের শক্তি উৎপাদনই বা ব্যাহত হচ্ছে কেন ?

কারিয়লের বিজ্ঞানীরা জলের নিচে অস্ত্রটি ফাটিয়েছে যার জন্যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ কুয়াশার সৃষ্টি হয়েছে আর ঐ কুয়াশার জন্যেই আমাদের শক্তি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ঐ কুয়াশার মধ্যে অর্থাৎ বায়ু-মণ্ডলে এমন কিছু কণা সঞ্চারিত হয়েছে যার জন্যে এই অবস্থা।

সেই বিজ্ঞানী পাল্টা প্রশ্ন করল, তাহলে আপনি বলতে চান যে যতদিন এই কুয়াশা থাকবে ততদিন আমাদের কোনো রকম শক্তি পুরো মাত্রায় উৎপাদিত হবে না ?

আমি তাই মনে করি এবং সমুদ্রে আমাদের যেসব জাহাজ, স্ফটিক বা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চলে সেগুলিও চালানো যাবে না।

আমরা কি আকাশ থেকে এই কুয়াশা সরাতে পারি না ?

যে পর্যন্ত না ঐ কুয়াশা নিজে সরে যায় ততদিন আমরা কিছুই করতে পারব না।

কুয়াশা সরে যেতে কতদিন সময় লাগবে ?

তা আমি বলতে পারি না।

এবার আভিতা নিজে প্রশ্ন করল, আপনারা তো বিজ্ঞানী, অন্য দেশে বিজ্ঞানে কি কাজ হচ্ছে অথবা সে দেশের বিজ্ঞানীদেরও খোঁজখবর রাখেন তাহলে কি বলতে পারেন পরমাণু অস্ত্র তৈরি করার মতো যোগ্য বিজ্ঞানী কারিয়লে আছে কি না।

আমি যতদূর জানি সে রকম যোগ্য বিজ্ঞানী কারিয়লে নেই।

তাহলে ওরা পরমাণু অস্ত্র বানায় কি করে ?

গোলেটা জবাব দিল, ওরা নিশ্চয় আমাদের সূত্র চুরি করেছে।

চুরি করেছে ? কি করে চুরি করতে পারে ? আপনারা কি এতই অসতর্ক যে বিদেশীরা আপনাদের বিজ্ঞানাগার থেকে সূত্র চুরি করতে পারে ?

আমাকে ক্ষমা করুন, এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। গোলেটা বলল।

তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে আমাদের বিজ্ঞানাগার থেকে সূত্র চুরি হয়েছে নচেৎ কারিয়লের পক্ষে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করা অসম্ভব, তাই তো ?

আপনার অনুমান ঠিক মহারাণী।

আভিতার মুখ তখন লাল হয়ে গেছে। সে থরথর করে কাঁপছে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী ভয়ও পেয়েছেন। রাণী যে পরিমাণে উত্তেজিত হয়েছেন তাতে বিজ্ঞানাগারের সকলকে না কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

আভিতা বলল, আপনাদের বিজ্ঞানাগার থেকে সূত্র চুরি যায় নি, আপনারা কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে কারিয়লের হাতে সেই সূত্র তুলে দিয়েছেন। সেই বিশ্বাসঘাতককে আপনারাই খুঁজে বার করুন নচেৎ আমি আপনাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হব।

এই সময়ে নৌবহরের অধ্যক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে আভিতাকে বলল : মহারাণী আমার একটা বক্তব্য আছে।

কি বল ক্রুনো, আভিতা বললেন।

সমুদ্রের জোয়ারের জল যে পর্যন্ত আসত এখন সেই পর্যন্ত আসছে না বরঞ্চ দূরত্ব প্রতি দিনই এক হাত করে কমছে।

বিজ্ঞানীদের দিকে চেয়ে আভিতা বলল, ক্রুনোর কথা আপনারা শুনলেন। এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে আপনারা আমাকে তিন দিনের মধ্যে জানাবেন।

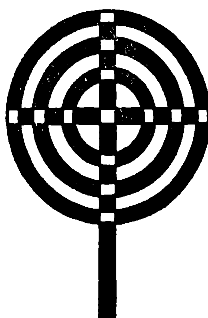
বারোটি রাজ্য নিয়ে আটলানটিস রাজ্য গঠিত তাই আভিতা মাথায় যে মুকুট পরে সেই মুকুটে হীরকখচিত বারোটি চূড়া আছে। বারোটি রাজ্যের প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিল। একটি রাজ্যের প্রতিনিধি উঠে দাঁড়িয়ে বলল :

আমার রাজ্য কারিয়ল দেশের পাশে। আমি আমার রাজ্য থেকে খবর পেয়েছি যে সেখানে শস্যের ব্যাপক হানি হচ্ছে। এখন ফসল তোলার সময় হয়েছে কিন্তু শস্য এবং অনেক গাছের ফল ঝরে পড়ে যাচ্ছে অথচ কীটের আক্রমণে এই ক্ষতি হচ্ছে না। কোনো কারণ এখনও জানা যায় নি।

বিজ্ঞানীদের আসনের দিকে চেয়ে আভিতা বলল, সলত্রিয়াস আপনি তো কৃষি-বিজ্ঞানী, আপনি আমাদের দেশে নতুন ধরনের বীজ সৃষ্টি করে কৃষির অনেক উন্নতিসাধন করেছেন, এই ব্যাপক শস্যহানির বিষয় কিছু বলতে পারেন ?

সলত্রিয়াস বললেন : সমুদ্রের নিচে ঐ পারমাণবিক বিস্ফোরণ এজন্যে দায়ী হতে পারে তবে শস্যক্ষেত্রে যেয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে কিছু বলা যায় না। অনুমানে নির্ভর করে আমি কিছু বলতে রাজি নই।

বেশ তাহলে আপনি নিজেই ঐ রাজ্যে যান বা লোক পাঠিয়ে কারণ অনুসন্ধান করুন কিন্তু আজ কি আমি কোনো ভালো খবর শুনব না ? এতক্ষণ যা শুনলুম তা সবই খারাপ খবর। আমার মন বিক্ষিপ্ত, আজ তা হলে সভা মুলতুবি হোক, আমরা আবার কাল সকালে বসব। রাত্রে আমরা নৈশভোজে মিলিত হব, আপনারা সকলে আসবেন।



রাজসভা থেকে ফিরে আভিতা নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে পোশাক বদলে একটা হালকা পোশাক পরল তারপর প্রশস্ত বারান্দায় এসে বসল। বিরাট বারান্দা, অন্তত দুশো মানুষ বসতে পারে। মাঝে মাঝে শ্বেত-

পাথরের থাম, মেঝে নীল মারবেলের। কয়েকটা স্ফটিকের স্তম্ভ আছে মাঝে মাঝে। রাত্রি হলেই এগুলো আলোকিত হয়। এই সব স্ফটিক স্তম্ভ দিনের বেলায় সৌরশক্তি আহরণ করে আর সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো বিকিরণ করতে থাকে। এখানে মাত্র চারটে স্ফটিক স্তম্ভ আছে তাতে যে আলো হয় সে আলো পূর্ণিমার আলোর সমান, ঐরকম স্নিগ্ধ। স্ফটিক স্তম্ভের সংখ্যা বাড়ালে আলো আরও জোর হবে।

আকাশে মেঘ থাকলেও স্ফটিক স্তম্ভগুলির অদৃশ্য সৌরশক্তি আহরণ করতে অসুবিধা হয় না। যে স্ফটিক দিয়ে এই স্তম্ভগুলি নির্মিত সেই স্ফটিক দুষ্প্রাপ্য, মাত্র দুটি খনি পাওয়া গেছে এবং খনিটি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। সাধারণ মানুষের বাড়িতে এরকম স্ফটিক স্তম্ভ নেই। যদিও বা আছে তাও হয়তো একটা টুকরো মাত্র যা অন্ধকার দূর করতে সাহায্য করে। ধনীদের বাড়িতে অবশ্য স্ফটিক স্তম্ভ আছে তবে তা দু তিনটের বেশি নেই।

রাজপ্রাসাদ ছাড়া কয়েকটি মন্দিরে বেশ কয়েকটি স্তম্ভ আছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্তম্ভ প্রাসাদেই আছে। প্রাসাদে গোলাকার একটি স্ফটিক আছে। আকারে সেটি একটি বাতাপি লেবুর সমান।

এই গোলাকার স্ফটিকটি প্রাসাদে দীর্ঘদিন থেকে আছে। কবে থেকে তা কেউ জানে না। এই স্ফটিকের বিশেষ একটা গুণ আছে। এই স্ফটিক সামনে রেখে প্রবাসী কোনো ব্যক্তিকে চিন্তা করলে তাকে এই স্ফটিকে দেখা যাবে। সে সময় সেই ব্যক্তি যা কিছু করছে তার সব ছবি স্ফটিকে প্রতিফলিত হবে। তবে স্ফটিক নিয়ে অন্ধকার ঘরে একা বসতে হবে।

আভিতার পিতা স্ফটিকের সেই খনিতে এমন একটি স্ফটিক আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলেন যাতে ভবিষ্যতের ছবি প্রতিফলিত হবে কিন্তু সারাজীবন চেষ্টা করেও রাজা তেমন স্ফটিকের সন্ধান পান নি।

বারান্দায় এসে বসবার একটু পরে মাহাশান এল। আভিতা ভাবছিল দেহটা ম্যাসাজ করিয়ে স্নান করতে যাবে কিন্তু আপাততঃ তা স্থগিত রাখতে হলো। এমন নয় যে আভিতা নিজের দেহ উন্মুক্ত করে কখনও মাহাশানের সামনে দেহ ম্যাসাজ করায় নি কিন্তু বর্তমানে দেশের অবস্থা

মোটেই ভালো চলছে না এবং মাহাশান নিশ্চয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আলোচনা করতে এসেছে নচেৎ এই সময়ে সে আসে না। মাহাশান জানে এই সময়ে আভিতা বিশ্রাম নেয়।

মাহাশান তাকে শিশুকাল থেকে দেখে আসছে। তার শয়নকক্ষেও তার অবাধ গতি। তাকে লজ্জা নেই। কিন্তু দেহ ম্যাসাজ করাতে করাতে রাজ্যের জরুরী বিষয় আলোচনা করলে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া যায় না। তাই আভিতা আপাততঃ ম্যাসাজ স্থগিত রাখল।

মাহাশান কাছে আসতে আভিতা বলল: বসুন মাহাশান, একপাত্র ফলের রস খান। আজ আপনি পরিশ্রান্ত ও চিন্তিত।

বেশ আনাও কিন্তু তুমি খাবে না ?

আমিও খাব তবে ফলের রস নয়, আমি একটু সুরা পান করব, আমি শুধু পরিশ্রান্ত নই চিন্তিত ও বিভ্রান্ত। পারমাণবিক শক্তি ও বিস্ফোরক সম্বন্ধে সূত্র কি করে চুরি হয় ?

আটলানটিসের নৈতিক মান অনেক নেমে গেছে, এ দেশের ধ্বংস অনিবার্য এবং আসন্ন। জুপিয়া নামে সেই যে রমণী যে নাকি ক্লিটো দেবীর মন্দিরে ধর্ণা দিলে ভবিষ্যৎ দেখতে পায় সে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, শুনেছ কি ?

না মাহাশান আমি শুনি নি, জুপিয়া কি বলেছে ?

জুপিয়াকে নাকি দেবী ক্লিটো বলেছেন শীঘ্রই আটলানটিস সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে বেশ কিছু নরনারী পালতোলা নৌকোয় চেপে ভিন্ন দেশে যাবার জন্যে পাড়ি জমিয়েছে।

আমি জুপিয়ার কথা বিশ্বাস করি না মাহাশান।

কিন্তু অতীতে ওর ভবিষ্যদ্বাণী সবগুলো না হলেও কয়েকটা তো সত্য হয়েছে আভিতা।

সেগুলি ঘটতই, জুপিয়া বলেছে বলেই যে ঘটেছে তা নয়। এতবড় একটা দেশ কি করে সমুদ্রের তলে তলিয়ে যেতে পারে? খানিকটা অংশ হয়তো তলিয়ে যেতে পারে তা বলে সারা দেশটা ? আর তলিয়ে যদি যায় তো

আমরা কি করতে পারি ?

এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

আচ্ছা মহাশান ঐ বিদেশীদের কোনো খবর পেয়েছ ? ওরা কোথা থেকে এসেছে ? ওদের মতলব কি ?

না এখনও পাই নি তবে আজ রাত্রে পাব।

শোনো মাহাশান, আমার মনে হয় ওরা কারিয়লের কোনো প্রদেশের মানুষ। কারিয়লের রাজা সঙ্গর ওদের পাঠিয়েছে। ওদের সঙ্গে কয়েকজন গুপ্তচরও এসেছে। গুপ্তচররা নিশ্চয় বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে কাজ হাসিল করছে। আর ঐ লোকগুলো আবরণ, আমাদের ধোঁকা দেবার জন্যে ওগুলো সঙ্গর ছেড়ে দিয়েছে। আমরা ওদের গুপ্তচর মনে করে ওদের ওপর নজর রাখব আর সেই সুযোগে আসল গুপ্তচররা কাজ হাসিল করবে, সঙ্গর ভীষণ ধূর্ত।

কিন্তু মা আমি তো তোমার বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমি তো এমন ধারণা করতেই পারি নি। যাই হোক আসল গুপ্তচরদের খুঁজে বার করতে হবে।

শুধু গুপ্তচর নয় মাহাশান, কয়েকজন বিশ্বাসঘাতককেও খুঁজে বার করতে হবে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ না কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের পারমাণবিক সূত্র সঙ্গরের হাতে তুলে দিয়েছে। সেই সূত্রের সাহায্যে সঙ্গর পরমাণু অস্ত্র বানিয়ে সমুদ্রের নিচে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমাদের বিপদে ফেলেছে। সেই বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজে বার করতেই হবে।

আমি তোমার কাছে আসবার আগে আমাদের গুপ্তচর প্রধানকে ভর্ৎসনা করে এসেছি এবং বলে এসেছি তিন দিনের মধ্যে সেই বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বার করতে না পারলে তাকে পদচ্যুত করা হবে। কিন্তু আমি যে জন্যে এসেছি সেই কথাটাই তো এতক্ষণ বলা হয় নি।

কি কথা মাহাশান ?

কথা এমন কিছু নয় কিন্তু আমার কেমন ভয় করছে, হাজার হোক বয়স হয়েছে তো মা, মনের জোর কমে আসছে।

তুমি তো আমার কথা শুনবে না মাহাশান, কতবার বললুম পুনর্নব প্রকোষ্ঠে যাও, পুনর্যৌবন লাভ করে ফিরে এস, তোমার দেখাশোনার জন্যে অফুরন্ত যৌবনবতী নারী পাঠিয়ে দোব নতুন উৎসাহে কাজ কর তা তো তুমি শুনবে না।

কিন্তু মা তার আর বোধহয় দরকার হবে না, তার আগেই আমার মনে হচ্ছে আটলানটিস হয় ধ্বংস হয়ে যাবে কিংবা আমাদের হস্তচ্যুত হয়ে যাবে।

আঃ তুমি বড় বেশি কথা বল মাহাশান, কি হয়েছে খুলে বল তো।

বলছি, কালিয়রের রাষ্ট্রদূত কাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, বলছে খুব জরুরী। সে একা আসবে না, সঙ্গর একজন বিশেষ দূত পাঠিয়েছে, তাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে।

কালই দেখা করতে চায় ?

হ্যাঁ, কালই দেখা করতে চায়।

তাহলে তুমি ঐ দূত দুজনকে আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ কর, তুমিও আমার সঙ্গে আহার করবে, এতে ভয়ের কি আছে ?

সঙ্গরের কিছু মতলব আছে।

মতলব তো আছেই তা নইলে আমার কাছে বিশেষ দূত পাঠাবে কেন ?

আটলানটিসের ওপর অনেক দিনের লোভ, এই দূত পাঠানর পশ্চাতে ওর কোনো কুমতলব আছে।

কি জান মা, সঙ্গর জানে যে সম্মুখ সমরে সে আমাদের সঙ্গে পারবে না, আমাদের লোকবল, অস্ত্রবল, অর্থবল ওর চেয়ে অনেক বেশি। সে তার বিশেষ দূত মারফত একটি বিশেষ প্রস্তাব পাঠাবে···

মাহাশান থামল। আভিতা জিজ্ঞাসা করল, থামলে কেন মাহাশান ? কি এমন প্রস্তাব যে তুমি বলতে চাইছ না ?

সঙ্গর এখনও অবিবাহিত জান তো ?

তা তো জানি, সে আমাকে বিয়ে করে তার রাণী করতে চায়, এই তো? তুমি অনুমান করছ যে সে তার বিশেষ দূত মারফত আমার কাছে এই প্রস্তাব পাঠাবে ?

হ্যাঁ মা, আমার তাই অনুমান। তুমি যদি তাকে বিয়ে করতে রাজি হও তাহলে বিনা যুদ্ধে সে আটলানটিস লাভ করবে এবং নিজেকে এই মহাদেশের অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভূখণ্ডের সম্রাট বলে ঘোষণা করবে।

তা অবশ্য সে একদিন করবে?

কি বলছ মা তুমি? তুমি তাহলে সঙ্গরের প্রস্তাবে রাজি হবে। সঙ্গরের বংশপরিচয় কি? ওরা অসুর তোমাদের বংশের চাইতে অনেক নিচে, তার বংশের আভিজাত্য বলে কিছু নেই, না মা এ হয় না।

আমি কি তোমাকে বলেছি মাহাশান যে আমি সঙ্গরকে বিয়ে করব? আমি বিয়েই করব না যদিও তুমি জান যে আমি কুমারি নই এবং কুমারি থাকতেও ইচ্ছে করি না অথচ বিয়েও করব না। পিতা তো নিষেধ করেছেন এবং এক স্বামী নিয়ে আমি তৃপ্ত থাকতে পারব না।

তাহলে সঙ্গর কি করে আটলানটিসের সম্রাট হবে?

সঙ্গর আমার শত্রু হলেও তার অনেক গুণ আছে। তার দেহে শক্তি আছে, তার সাহস আছে এবং তার বুদ্ধিও আছে, বয়সও আমার চেয়ে বেশি নয়, স্বামী হিসেবে লোভনীয় এবং তার সঙ্গে আমি হয় তো কয়েকটা নিশি যাপন করতেও পারি···

থাম মা থাম, ওসব কথা তুমি এই বৃদ্ধকে শুনিয়ো না, তুমি কাল মধ্যাহ্নে কারিয়লের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে দেখা করবে কি না বল।

তোমাকে তো আগেই বলেছি দেখা করব এবং আমরা একত্রে আহার করব তবে আর কি কিন্তু মাহাশান আমার কথাটা শেষ করতে দাও।

বেশ বল, মাহাশান বলল :

স্পষ্ট করেই বলছি। সঙ্গরকে আমি বিয়ে করব না। আমি আমার বোন তারিতার সঙ্গে তার বিয়ে দোব। তুমি তো জান তারিতা আমার নিজের মায়ের মেয়ে নয়, সে আমার সৎ বোন, ওর মা কোনো বড় বংশের মেয়ে নয়, সে আমার সৎ বোন তবুও তারিতাকে আমি খুব ভালবাসি। আমি তারিতার সঙ্গে সঙ্গরের বিয়ে দোব এবং তাকে বলব যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন আমি আটলানটিসের রাণী থাকব, ততদিন সঙ্গরের আমার

দেশে প্রবেশ নিষেধ, আমার মৃত্যুর পর সঙ্গর এবং তারপর সঙ্গর ও তারিতার সন্তান আটলানটিসের সিংহাসনে বসবে।
তাহলে মা সাহস দাও তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।
সাহস তো তোমাকে আগেই দেওয়া আছে মাহাশান, বল কি বলবে।
তোমার বোনের বিয়ে দেবার পর তুমি কি মাঝে মাঝে পুনর্নব প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে তোমার আয়ু বাড়িয়ে যাবে যতদিন না সঙ্গরের মৃত্যু হয় এবং সঙ্গর মারা গেলে তুমি কারিয়ল দখল করে মহাদেশের সম্রাজ্ঞী হবে?
সে তোমাকে এখন বলব না মাহাশান। শোনো, পুনর্নব প্রকোষ্ঠের খবর সঙ্গর জানে না, দেখো যেন এ খবর ফাঁস না হয়। পুনর্নব প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করি আর না করি আমি আমার যৌবন অটুট রাখতে চাই। আমার মাথায় আর একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলছে। তারিতার বিয়ের পরই তাকে সেই ওষুধটা সুরার সঙ্গে খাইয়ে দোব যে ওষুধ খেলে কোনো নারী জীবনে সন্তানবতী হতে পারে না।
কি সর্বনাশ! তুমি এমন কাজ করবে?
দেখ মাহাশান আমি আটলানটিসকে আমার প্রাণের চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি, সেই দেশ রক্ষার জন্যে আমি সব করতে পারি।
বেশ মা যা ভালো বোঝো কর, তাহলে আমি কারিয়লের রাষ্ট্রদূতদের কাল মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তুমি তো এখন স্নান করতে যাবে, তাহলে আমি আসি।
এস মাহাশান, আজ সন্ধ্যায় একবার এস, আমি বাগানে থাকব, পসিডনের মূর্তির নিচে।
আসব।
মাহাশান চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন ক্রীতদাসী এলো। একজনের হাতে একটি থালায় কয়েকটি বাটি বসানো। বাটিগুলিতে কয়েক রকম তেল ও সুগন্ধী মলম। নানারকম গাছগাছড়া, ফলের রস ও স্নেহ পদার্থ দিয়ে ঐ মলম তৈরি করা হয়েছে। ঐ মলম দেহে মালিশ করলে দেহবর্ণ হয় তপ্ত কাঞ্চনের মতো, ত্বক কোনোদিন শিথিল হয় না।

ক্রীতদাসীরা এসে আভিতার দেহ থেকে বস্ত্রগুলি উন্মোচন করে নিল। তারপর তাকে মারবেলের একটি খাটের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দিল। পানপাত্রে তখনও কিছু সুরা বাকি ছিল। আভিতা সেই সুরাটুকু মাঝে মাঝে পান করতে লাগল আর ক্রীতদাসীরা তার দেহ মর্দন করতে লাগল। ওদিকে স্নানাগারে তার স্নানের জলে নানারকম খনিজ পদার্থ ও সুগন্ধী দ্রব্য মেশানো হতে লাগল।

তখনও সূর্যাস্তের কিছু দেরী আছে। আভিতা বাগানে এসেছে। সে আস্তে আস্তে পায়চারি করতে করতে কি ভাবছে। হয়তো আগামী কাল কারি-য়লের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিষয়।

একটু দূরে তারিতা তার তিনজন বান্ধবীর সঙ্গে খেলা করছে। বেশ গরম। হাওয়া নেই। আকাশে সেই কুয়াশা। কুয়াশা তো নয় যেন আটলানটিসের ওপর একটা অভিশাপ।

আভিতা ভাবছে তার দেশ বিজ্ঞানে এত উন্নতি করেছে আর এই বিষাক্ত কুয়াশা থেকে তাদের মুক্ত করতে পারছে না?

একটা ফোয়ারা ঘিরে ওরা চারজন খেলা করছিল। সোনার একটা ফাঁপা বল নিয়ে ওরা লোফালুফি করছিল। ওরা বেশ আছে। কোনো চিন্তা নেই। যেন একদল শিশু। বলটা মাঝে মাঝে পাশে ছোট একটা জলাশয়ে পড়ে যাচ্ছে বা কেউ ইচ্ছে করে ফেলে দিচ্ছে। কোনো একজন মেয়ে জলাশয়ের ধারে তার পোশাক খুলে রেখে জলে নেমে সেই বল তুলে আনছে। এটা হয়তো একটা খেলা। বেশ আছে ওরা শিশুর মতো।

পসিডনের মূর্তির নিচে আভিতা বসে ওদের খেলা দেখতে লাগল। একজন ক্রীতদাসী শীতল ফলের রস নিয়ে এল। আভিতা সেটি পান করে পান-পাত্র ক্রীতদাসীকে ফিরিয়ে দিল। সে চলে গেল।

আভিতা এখন মাহাশানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কুয়াশার জন্যে সূর্য কখন ডুবে গেছে কেউ টের পায় নি। অন্ধকার দ্রুত নেমে আসছে। আজ বুঝি পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নাধারায় আটলান্টা কি প্লাবিত হবে?

খেলা শেষ করে তারিতা দিদির কাছে ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে জিজ্ঞাসা করল : কি রে দিদি তুই একা বসে কেন ?

মাহাশান আসবে, তার জন্যে অপেক্ষা করছি, তুই ঘরে যা। শোন তোর বিয়ের ব্যবস্থা করছি, শিগগির তোর বিয়ে দোব।

তুই বিয়ে করবি না ? কার সঙ্গে বিয়ে দিবি রে ?

সে সব তুই জানতে পারবি। তুই এখন যা, ঐ বুঝি মাহাশান আসছে।

বল না দিদি, ওর আসতে এখনও দেরি আছে, ঐ দেখ ঐখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছে।

তোকে আমি রাণী করব তারিতা।

রাণী করবি ? কোন দেশের রে ? দেশ তো মোটে এই দুটো, আটলানটিস আর কারিয়ল, আর দূরে দূরে কি সব দেশ আছে আমি জানি না, তারা সভ্য কি অসভ্য তাও জানি না, বল না দিদি।

তোকে যদি কারিয়লের রাণী করি ?

কারিয়ল ? মানে সঙ্গরের সঙ্গে তুই আমার বিয়ে দিবি ? তুই বলছিস কি দিদি ? ওরা তো অসুর তারপর দেশটার অর্ধেকের চেয়ে বেশি তো বরফে ঢাকা।

এমন সময় মাহাশান এসে পড়ল। আভিতা বলল, সে আমি দেখব এখন এখন তুই যা তো।

বেশ যাচ্ছি দিদি, আমি কিন্তু সঙ্গরকে বিয়ে করব না বলে দিচ্ছি, এই কথা বলতে বলতে তারিতা তার সঙ্গিনীদের ডেকে নিয়ে চলে গেল।

মাহাশান কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল : কি গো মা দুই বোনে কি কথা হচ্ছিল ? আমরা একটু শুনতে পাই না।

আভিতা বলল, আমি তারিতাকে বলছিলুম তোকে আমি রাণী করব, সঙ্গরের সঙ্গে বিয়ে দোব তা ও বলল ওরা তো অসুর, ওকে আমি বিয়ে করব না, এই আর কি।

তা মা তোমার বোন কথাটা মন্দ বলে নি, সত্যিই অসুর, আমাদের তুলনায় ওরা বর্বর।

তুমি বসো মাহাশান ! কারিয়লের দূতদের আমন্ত্রণ জানিয়েছো তো ? ঠিক আছে। লোক দুটোকে কি রকম মনে হলো ? ওরাও অসুর। কথাবার্তা কেমন বলে ?

হাজার হ'ক রাষ্ট্রদূত তো, রুচি হয় তো আমাদের মতো মার্জিত নয় কিংবা শালীনতাবোধ হয়তো একটু কম তা হলেও ওরা দুজনেই বেশ বুদ্ধিমান, ওজন করে কথা বলে। এখন তোমার সঙ্গে কিভাবে কথা বলবে তা তো বলতে পারছি না।

একজন ক্রীতদাসী দু'জনের জন্যে শীতল ফলের রস ও কিছু ফল নিয়ে এল। দুজনে সেই ফল ও ফলের রস খেতে খেতে কারিয়লের রাজা সঙ্গর ও তার সম্ভাব্য প্রস্তাব নিয়ে কথা বলতে লাগল। প্রসঙ্গক্রমে আটলান-টিসের প্রসঙ্গও উঠল। মাহাশান বলল দেশের নৈতিক চরিত্রের রীতিমতো অবনতি হয়েছে। আমি বৃদ্ধ হযেছি আজকালকার যুবক যুবতীদের অশা-লীন ব্যবহার আমাকে রীতিমতো পীড়া দিচ্ছে। কিন্তু মা এও হয়তো আমি সহ্য করতে পারি কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে, সেটা তো আমি সহ্য করতে পারছি না।

আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে ? তুমি সেই চক্রান্ত ভাঙবার তাহলে কি ব্যবস্থা করছ ?

এখনও আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই নি। একজন নারী দেশের কর্ত্রী হবে এটা ওরা মেনে নিতে পারছে না। আমার বিশ্বাস সঙ্গরের গুপ্তচররা অনেক দিন থেকে—তোমার বাবার আমল থেকেই সক্রিয়। তারা প্রচুর উৎকোচ দিয়ে আমাদের কয়েকজন মন্ত্রী ও সেনাপতিকে ক্রয় করেছে।

শেষ বয়সে বাবা বড় বেশি উদার হয়ে পড়েছিলেন, কারও দোষত্রুটি বড় একটা দেখতেন না আর ক্ষমাশীল হয়েও পড়েছিলেন। আমি নিজে কয়েক-জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলুম। তিনি তাতে কর্ণপাত করেন নি উপরন্তু তাদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু এইরকম চক্রান্তকারীকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নই, আপনি ভালো করে খোঁজ করে সকল তথ্য আমাকে জানান তারপর দেখি, আমি কি করতে পারি।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা পার হয়েছিল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছিল ঠিকই কিন্তু সেই অশুভ কুয়াশা চাঁদকে ঢেকে রেখেছিল। উদ্যানের ওপর যে জ্যোৎস্না বর্ষিত হচ্ছিল তা ম্লান।

মাহাশান ও আভিতা দুজনেই আকাশের দিকে চমকে চাইল একটা পাখির কর্কশ চিৎকার শুনে। কোনো পাখি তারা দেখতে পেল না কিন্তু তারা যা দেখল তাও অবিশ্বাস্য।

সেই কুয়াশার রং বদলে গেল। রং হলো লাল। তারপর সেই কুয়াশা যেন গুটিয়ে যেতে লাগল, কিসের একটা আকার নেবে বুঝি। হ্যাঁ, সকলে দেখল আকাশে যেন আদিগন্ত বিস্তৃত বিরাট একটা হাত আবির্ভূত হলো তারপর সেই হাত যেন চাঁদকে টিপে ধরে পিসে ফেলতে চাইল। মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার নেমে এল। সে কি ভীষণ কালিমা, আভিতা মাহাশানকে দেখতে পাচ্ছে না। আভিতা ভয় পেয়ে মাহাশানকে জড়িয়ে ধরল।

সারা শহরে ক্রন্দন রোল উঠল। আবার যখন সেই ম্লান জ্যোৎস্না ফিরে এল তখন শহরের সকল নরনারী যেখানে যে অবস্থায় ছিল সেখানে সেই অবস্থায় হাঁটু গেড়ে বসে আকাশের দিকে চেয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগল।

মাহাশান অনুভব করল আভিতা তাকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে, তার চোখে জল। মাহাশান তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। জিজ্ঞাসা করল, কি মা ভয় পেয়েছ ?

না মাহাশান আমি ভয় পাই নি কিন্তু আমি আশংকা করছি আমাদের দিন বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে, শিগগির বোধহয় ভরাডুবি হবে, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, আকাশে তারই অশুভ ইঙ্গিত।

চল মা আমরা প্রাসাদে ফিরে যাই।

প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে মাহাশান বিদায় নিল। প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করে আভিতা দেখল তার মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্য এবং কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তার জন্যে অপেক্ষা করছে। তারা রীতিমতো উত্তেজিত।

আভিতাকে দেখে সকলেই সমস্বরে কিছু বলতে চাইল।

আভিতা তাদের শান্ত করে বলল, আপনারা আকাশে ছায়া দেখে বৃথাই ভয় পাচ্ছেন, ওটা সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা। বাবার কাছে শুনেছি অনুরূপ একটা হাত দেড়শ বছর আগে দেখা গিয়েছিল কিন্তু তার পরের পূর্ণিমা থেকে দেশে নানা দিকে নানারকম উন্নতি ঘটেছিল। অতএব আমাদের ভীত হবার কোনো কারণ নেই। আপনারা ঘরে ফিরে যান, শংকার কোনো কারণ নেই তথাপি আমি কালই ক্লিটো দেবীর মন্দিরে পূজোর আয়োজন করব এবং দেবী যদি আমাকে কোনো নির্দেশ দেন তাও আমি আপনাদের অবশ্যই জানাব। আপনারা আজ আসুন।

ওরা সকলেই চলে গেলেন। দেশে যাতে না অযথা ভীতির সঞ্চার হয় এইজন্যে আভিতা তাদের কাছে মিথ্যা কথা বলল। রাজনীতিতে প্রয়োজনবোধে মিথ্যা বলতে হয়।

নিজের ঘরে যাবার পথের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল অতি সুদর্শন, দীর্ঘকায়, পেশীবহুল, বর্ম পরিহিত এতজন যুবক তার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার কোমরে তরবারি ঝুলছে।

এই যুবককে আভিতা চেনে। সুরিটান রাজ্যের শাসনকর্তার ভাই এই যুবকের নাম ডার্নাল। আভিতা জানে ডার্নাল তাকে ভালোবাসে কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ করার সাহস তার হয় নি।

অভিতাকে দেখে যুবক কোমর বেঁকিয়ে নিচু হয়ে রাণীকে অভিবাদন জানাল। আভিতা মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল : কি খবর ডার্নাল ? আকাশে ঐ বিরাট হাত দেখে ভয় পেয়েছ বুঝি ?

না রাণী আমি ভয় পাই নি। বিপদ দেখলে আমার রক্ত নাচে। আমি অনুমান করছি রাণী হিসেবে নয় নারী হিসেবে আপনি হয়তো ভয় পেয়ে থাকতে পারেন।

না ডার্নাল আমি কিছু বিপদ আশংকা করছি কিন্তু তোমরা থাকতে আমার ভয় কি ?

আর একবার কোমর বেঁকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে তরবারির হাতল স্পর্শ করে

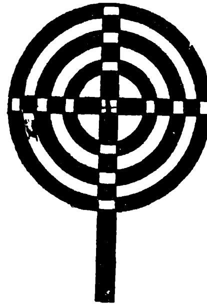
ডার্নাল বলল, রাণী আমি তোমার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, আমি আজ সারারাত্রি তোমার শয়নকক্ষের বাইরে পাহারা দোব···।

তার প্রয়োজন হবে না ডার্নাল কিন্তু অযথা প্রাণটা দিয়ো না কারণ তুমি বেঁচে থাকলে আমার অনেক কাজ করতে পারবে, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও, রাত্রির আহার হয়েছে ?

রাণী তুমি কি তোমার সকল রক্ষীকে বিশ্বাস কর ? না, তোমার নিষেধ আমি মানব না। আমি সারারাত্রি হাজির থাকব। আহার ? না এখনও হয় নি।

বেশ তাহলে তুমি একটু অপেক্ষা কর আমার সঙ্গে আহার করবে।

সুদর্শন ও সাহসী এই যুবকের প্রতি আভিতারও কিছু দুর্বলতা আছে এবং আরও কয়েকজনের প্রতিও। আভিতা কয়েকজনকে প্রশ্রয় দিয়েছে কিন্তু ডার্নাল এখনও রাণীর কোনো অনুকম্পা পায় নি।



নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে কারিয়লের রাষ্ট্রদূত নভোক এবং রাজা সঙ্গর প্রেরিত বিশেষ এবং তার ব্যক্তিগত দূত জোম্বি রাজপ্রাসাদে এসে গেছে। মাহাশান তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ওপরে বারান্দায় বসিয়েছে। রাণীকে খবর দেওয়া হয়েছে।

ওরা তিনজনে সাধারণ বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে। বিরাটাকার প্রায়নগ্ন দুজন ক্রীতদাস হাতে বড় পাখা নিয়ে অতিথিদের হাওয়া করছে। একজন ক্রীতদাসী শীতল ফলের সরবত এনে অতিথিদের পরিবেশন করে বলল সম্রাজ্ঞী এখনি আসছেন। তিনি স্নান করছিলেন।

ক্রীতদাসী সুন্দরী, উর্ধাঙ্গ অনাবৃত গলায় হার, মুখে হাসি। তাকে লক্ষ্য করে সঙ্গরের বিশেষ দূত মন্তব্য করল: আপনাদের ক্রীতদাসীরাও সুন্দরী তবে আমাদের দেশের সকল নারী অনেক বেশী স্বাস্থ্যবতী, তারা তাদের যৌবন ধরে রাখতে পারে না এতই অফুরন্ত।

মাহাশান কোনো মন্তব্য করল না। ক্রীতদাসীর রূপ নিয়ে আলোচনা করতে তার রুচিতে বাধে।

কোথায় কোন অদৃশ্য স্থান থেকে সুমধুর সঙ্গীত ভেসে আসতে লাগল। রাণী এলো। রূপালি রঙের একটি পোশাক দ্বারা তার দেহ আবৃত।

রাণী আসতে রাষ্ট্রদূত দুজন উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল। রাণী প্রতি অভিবাদন জানিয়ে তাদের ভোজন ঘরে যাবার আমন্ত্রণ জানাল। আগেট নির্মিত টেবিলে নানারকম খাদ্য, ফল ও মিষ্টান্ন সাজান হয়েছে।

রাণী তাদের আসন গ্রহণ করতে বলল। রাষ্ট্রদূত নিজের পরিচয় দিয়ে বলল: তার নাম নভোক আর বিশেষ দূত বলল: তার নাম জোম্বি।

একজন ক্রীতদাসী আভিতার দেহ থেকে রূপালি আবরণটি উন্মোচন করে নিল। অতি সূক্ষ্ম ও সরু সোনার তারের কারুকার্যখচিত কাঁচুলি আভিতার বক্ষযুগল আবৃত করেছে। নিম্নাঙ্গও স্বর্ণখচিত বস্ত্র দ্বারা আবৃত। উর্ধাঙ্গ অনাবৃত। মাথায় ফুলের মালা।

আভিতা সুন্দরী কিন্তু এই সোনালী পোশাকে তার রূপ যেন শতগুণে বিকশিত। দেহে কোনো অলংকার নেই, গলায় পিতার সেই রত্নটি ব্যতীত।

পরস্পর কুশল বিনিময়ের পর আহার আরম্ভ হলো। সঙ্গীত থামে নি, সুর মাঝে মাঝে পালটাচ্ছে। আবহাওয়া কিছু তপ্ত কিন্তু পরিবেশ ভারি চমৎকার।

দুই রাষ্ট্রদূত নিমেষহীন দৃষ্টিতে আভিতার দিকে চেয়ে রইল। তাদের চোখের পলক পড়ছে না, এমন রূপ তারা দেখে নি।

তাদের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে আভিতা বলল, নিন আরম্ভ করুন, দেরি করে লাভ কি?

তারা দুজনেই চমকে উঠলো। হাজার হোক তারা রাজার প্রতিনিধি, কাঙা-লের মতো এইভাবে পরনারীর প্রতি চেয়ে থাকা তাদের উচিত হয় নি। নিজেদের সামলে নিয়ে তারা অস্ফুট স্বরে কিছু বলে আহারে মনোনিবেশ করল।

হঠাৎ নভোক চমকে উঠলো।

কি হলো? আভিতা প্রশ্ন করল, আহার্যে কোনো ত্রুটি?

ক্ষমা কর রাণী, আমরা দুজনেই তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে আমাদের একটি অমার্জনীয় ত্রুটি হয়েছে। সেটি এখন সংশোধন করছি। আমাদের মহামান্য রাজা আপনাকে একটি উপহার পাঠিয়েছেন, আপনি সেটি গ্রহণ করলে আমরা কৃতার্থ হব।

নভোক একটি সুদৃশ্য পেটিকা আভিতার হাতে তুলে দিলো। আভিতা পেটিকাটি খুলে তার ভেতর থেকে মূল্যবান সহস্র রত্নখচিত একটি নেকলেস বার করল।

অলংকারের প্রতি নারীজাতের দুর্বলতা আছে। আভিতা সেটি দেখতে দেখতে বলল, ভারি সুন্দর, আমি এটি গ্রহণ করলুম কিন্তু এখন আমি এটি পরতে পারব না কারণ আমার কণ্ঠে আমার পিতৃপ্রদত্ত যে রত্নটি রয়েছে সেটি আমি এখন খুলতে পারব না, অন্ততঃ যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে আলাপ করব কারণ ঐ রত্নটি মন্ত্রপূত, আমাকে প্রেরণা যোগায়।

নেকলেসটি সযত্নে একপাশে রেখে দিয়ে আভিতা অতিথিদের বলল, তাহলে আবার আরম্ভ করা যাক কিন্তু নভোক আমি ভাবছি তোমাদের রাজা এত মূল্যবান উপহার আমাকে পাঠালেন কেন, বিনিময়ে সঙ্গর কিছু আশা করে, তাই না নভোক?

কথাটা তুমি যখন খোলাখুলি বললে রাণী তখন আমরাও বলি, আমাদের রাজা তোমাকে চান।

আভিতার মুখ লাল হয়ে গেল। অসুর রাজার আস্পর্ধা তো কম নয় কিন্তু এই দুই রাষ্ট্রদূতের সামনে সে তার ক্রোধ প্রকাশ করতে চায় না তথাপি অবজ্ঞার সুরে বলল:

আমাকে মানে সঙ্গর আটলানটিস চায়, এই তো ?

না রাণী তুমি ভুল করছ, আমাদের রাজা শুধু তোমাকেই চায় আর কিছু নয়। নভোক বলল :

জোম্বি নভোকের কথা সমর্থন করে বলল, হ্যাঁ রাণী, আমাদের রাজা আপনাকে বলতে বলেছেন যে আটলানটিসের প্রতি তাঁর কোনো লোভ নেই, তিনি চান আপনি তাঁর সম্রাজ্ঞী হবেন এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির মাতা হবেন।

আভিতার মুখ আবার লাল হয়ে উঠলো। এমন নির্লজ্জ প্রস্তাব অসভ্য, অশিক্ষিত অসুররাই করতে পারে। তবুও আভিতা নিজেকে সংযত করে বলল : কিন্তু তোমাদের রাজা তো আমাকে দেখেন নি তবে আমাকে কি করে চাইতে পারেন ?

এ কি কথা বলছ রাণী। তোমার এই আশ্চর্য রূপ কি চাপা থাকে ? তোমার রূপের প্রশংসা আমাদের রাজার কানে অনেক দিন আগেই পৌঁছেছে।

আভিতা বলল, হতে পারে তোমাদের রাজা অনেক কিছু শুনেছে কিন্তু এ কথাও ঠিক যে আমি আটলানটিসের বাইরে নই, আমি তারই অন্তর্ভুক্ত অতএব তোমাদের রাজা একত্রে রাজকন্যা ও রাজত্ব চাইছে। সঙ্গর চায় বিনা যুদ্ধে অথচ শান্তিপূর্ণভাবে আটলানটিস দখল করতে কিন্তু জোম্বি আমি যদি বলি যে কারিয়লের রাজা সঙ্গরের প্রস্তাবে আমি নিজেকে গর্বিত বোধ করছি কিন্তু সে আমাকে যে সম্মান দিতে চাইছে তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম, তাহলে ? তাহলে কি যুদ্ধ অনিবার্য ?

নভোক একটু বাঁকা হাসি হেসে বলল, সে কথা কি আমরা বলেছি রাণী অথবা তেমন কোনো আভাস দিয়েছি ?

না তা তোমরা বল নি, কেউ সরাসরি বলেও না কারণ এই হলো কূটনীতি কিন্তু শোনো নভোক আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর পেয়েছি যে আটলানটিসের ওপর সঙ্গরের লোভ অনেক দিনের। একথা তোমরা অস্বীকার করতে পার না এবং এই উদ্দেশ্যেই সঙ্গর আমাদের পরমাণু অস্ত্রের সূত্র

চুরি করেছে এবং বিস্ফোরক তৈরি করে সমুদ্রের তলে পরীক্ষা করেছে যার ফলে আমাদের আকাশে এই অলুক্ষুণে কুয়াশা আজও বিরাজ করছে কিন্তু সেই অস্ত্র যে আটলানটিসের ওপর সে প্রয়োগ করতে সাহস পাবে না কারণ ঐ অস্ত্র আমাদেরও আছে। সে জানে যে এই আটলানটিসের ওপর এই অস্ত্র প্রয়োগ করলে দেশটা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সেই ধ্বংস-স্তূপ তার কাজে লাগবে না উপরন্তু তার দেশের ওপর আমাদের পরমাণু অস্ত্র পড়বার ঝুঁকি আছে। কি ঠিক বলছি কি না?

নভোক কোনো উত্তর দিলো না। সে জোম্বির দিকে চাইল। জোম্বি তখন অবাক হয়ে আভিতার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। তারপর সে চাইল মাহাশানের দিকে। তার মুখে মৃদু হাসি। রাণী উত্তেজনায় কাঁপছে। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, বুক ওঠানামা করছে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা বন্ধ। সকলে আহার নিয়ে ব্যস্ত হলো। পরিবেশ কিছু শান্ত হলো। আভিতা আবার বলতে আরম্ভ করল :

আমি সঙ্গরের সাহসের প্রশংসা করি। সে প্রেমিক নয়, মনেপ্রাণে সে বিজেতা, সে চায় তার রাজত্বের বিস্তার এবং কোনোদিন সে তার এই ইচ্ছা থেকে বিরত হবে না। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমি আটলানটিস কারও হাতে তুলে দোব না তবে আমি কোনোদিন বিবাহ করব না এবং একদিন হয়তো সঙ্গর বা তার পুত্র আটলানটিসের সিংহাসনে বসবে। কিন্তু আমি সঙ্গরকে বিয়ে করব না।

দুই রাষ্ট্রদূতই আভিতার মুখের দিকে চাইল। মাহাশান নীরবে আহার করে যাচ্ছে।

আভিতা মৃদু হেসে বলল, তোমরা বুঝি অবাক হচ্ছ, ভাবছ এ কি কথা রাণীর মুখে, সঙ্গরকে রাণী বিয়ে করবে না অথচ সঙ্গরের সন্তান আটলান-টিসের সিংহাসনে বসবে এটা কি করে হয়? অথচ আমি চাই যে আমার পরে আমারই কেউ আটলানটিসের সিংহাসনে বসবে।

নভোক আভিতার বুকের দিকে চেয়ে বলল : তোমার হেঁয়ালি আমরা বুঝতে পারছি না রানী।

আভিতা বলল : তাহলে শোনো রাষ্ট্রদূত; তোমরা দেশে ফিরে তোমাদের রাজাকে আমার এই বার্তা জানাবে যে সম্রাজ্ঞী আভিতা সম্রাট সঙ্গরের প্রস্তাবে নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছেন কিন্তু সম্রাট তাকে যে সম্মান দিয়েছেন সে সম্মান গ্রহণ করতে আভিতা অক্ষম এবং নিজেকে সেই সম্মানের অযোগ্য মনে করে কিন্তু আভিতা সম্রাটকে নিরাশ করতে চায় না। আভিতা চায় তার প্রিয়তমা, সুন্দরী ও কোমল স্বভাবা ভগিনী তারিতার সঙ্গে সম্রাট সঙ্গরের বিবাহ দিতে। আশাকরি সঙ্গর এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে, তারিতা তার যোগ্য সহধর্মিনী হবে এবং সঙ্গরের আশাও পূরণ হবে।

নভোক ও জোম্বি পরস্পরের মুখের দিকে অবাক হয়ে চাওয়াচায়ি করতে লাগল। আভিতা তখন চেয়ারে হেলান দিয়ে সুরার পাত্র হাতে তুলে নিল। ঠোঁটে হাসি।

নভোক জিজ্ঞাসা করল, তাহলে এই তোমার সিদ্ধান্ত রাণী ?

হ্যাঁ নভোক, এই আমার সিদ্ধান্ত। আমি চাই শান্তি, একটা যুদ্ধবিগ্রহ হোক এটা আমি চাই না এবং তোমরাও চাও না আশা করি।

জোম্বি বলল, রাণী তুমি স্পষ্ট ভাষাতেই তোমার মত ব্যক্ত করেছ, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ, আমাদের রাজাও আটলানটিসের সঙ্গে যুদ্ধ চায় না তবে একথা ঠিক যে আমাদের রাজার পিতা এবং রাজারও ইচ্ছা যে আটলানটিস তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হোক। তবে এটাও ঠিক যে বর্তমানে আমাদের রাজা আটলানটিস নয়। আটলানটিসের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আভিতাকে চায়।

আভিতা বিরক্ত হয়ে বলল, অসম্ভব, তা হয় না, আমি যা বলেছি তোমরা দেশে ফিরে গিয়ে সেই কথাই বলবে।

নভোক বলল, তাহলে রাণীর এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ?

মুখ থেকে সুরাপাত্র সরিয়ে আভিতা বলল, হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।

জোম্বি বলল, আমাদের আর একটা কথা আছে, কথা নয় খবর। আজ সকালে কারিয়ল থেকে একজন বিশেষ দূত রাজার একটি জরুরী বার্তা

নিয়ে আটলানটায় এসেছে।
কি জরুরী বার্তা ? মাহাশান প্রশ্ন করল।
রাণী আভিতার মুখ থেকে তার প্রস্তাবের উত্তর স্বয়ং শোনবার জন্যে রাজা সঙ্গর নিজেই আটলানটায় আসছে তিন দিনের মধ্যে।
সকলে নির্বাক। আভিতা ও মাহাশান কোনো কথা বলল না। সকলে নীরবে পানাহার শেষ করল। রাষ্ট্রদূত দু'জন বিদায় নিল। মাহাশানকে আভিতা বলল : তাহলে সঙ্গর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই আসছে ?

আটলানটিসের সম্রাজ্ঞী আভিতা একটা জরুরী আলোচনা সভা ডেকেছে। বারোটি রাজ্যের শাসনকর্তা, সেই সব রাজ্যের মন্ত্রীরা তার নিজের মন্ত্রী-সভা, উপদেষ্টাগণ, বিজ্ঞানী, নৌ ও সেনাবাহিনীর প্রধান, সকলেই জরুরী ডাক পেয়ে সেই সভায় এসেছে।
সভা আরম্ভের আগে রাজপুরোহিত যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞ শেষ হলো কিন্তু তখনও আগুন নেবে নি। মাহাশান আভিতার হাতে একটা থলে দিলো। থলের ভেতরে আছে বারোটি রাজ্যের পবিত্র স্থানের মাটি। আভিতা থলে উপুড় করে সেই মাটি যজ্ঞের অগ্নিশিখার ওপর ঢেলে দিলো। কিছু পরে আগুন নিবে গেল।
রাজপুরোহিত যজ্ঞাগ্নির অবশিষ্ট ছাই মেড়ে সকলের কপালে তিলক পরিয়ে দিয়ে স্বস্তিবাচন পাঠ করে তিনি বিদায় নিলেন।
সভা আরম্ভ হলো। সেদিন রাত্রে চন্দ্রালোকে যে হাত আকাশে আবির্ভূত হয়ে চাঁদকে নিষ্পেষণ করেছিল অনেকে সেই হাতের উল্লেখ করে বিপদের আশংকা প্রকাশ করল।
আভিতা সেই হাতকে কোনো গুরুত্বই দিলো না। সে বলল দেড়শ' বছর আগে বাবা অমন হাত দেখেছিলেন, তারপর কোনো বিপর্যয় ঘটে নি। তাছাড়া আমি ক্লিটো দেবীর মন্দিরে বিশেষ পূজা ও বলিদান দিয়েছি। দেবীর কোনো আদেশ আমি পাই নি।
তবে আমি একটা রাজনীতিক বিপদ আশংকা করছি। সেটি বলবার

আগে কয়েকটা কথা বলবার আছে। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব উদারহৃদয় মানুষ ছিলেন, তিনি কখনও কঠোর হতে পারেন নি, দোষীকে সহজে সাজা দিতে চাইতেন না। ফলে আপনাদের মধ্যে অনেকে রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে গেছেন কিন্তু আমাদের মহামান্য প্রধানমন্ত্রী সেই চক্রান্ত ফলপ্রসূ হতে দেন নি। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে-ছিলেন।

সভার সকলে চুপ। চক্রান্তকারীরা ভয় পেয়ে গেল। এই বুঝি রাণী তাদের নাম বলে দিয়ে এখনি দণ্ডাদেশ দিয়ে দেবেন।

আভিতা বলল : সেই চক্রান্তকারীরা বর্তমানে আবার মাথা তুলছে। তারা আটলানটিসের সিংহাসনে একজন যুবতীকে সহ্য করতে পারছেন না! তারা ভিনদেশী এক ব্যক্তিকে আটলানটিসকে বিক্রি করে দেবার ষড়যন্ত্র করছে।

ষড়যন্ত্রকারীরা ভুলে গেছে যে আমার কাছে একটি স্ফটিক আছে। আমি সেই স্ফটিক মাধ্যমে সেই সব বিশ্বাসঘাতকদের ক্রিয়াকলাপ দেখতে পাই। আপাতত আমি অন্য একটি ঘটনা নিয়ে ব্যস্ত আছি নচেৎ এখনি বিশ্বাসঘাতকদের নাম প্রকাশ করে দিয়ে কঠোর শাস্তি দিতে পারতুন।

সভার এক প্রান্ত থেকে একজন উপদেষ্টা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শত্রুর শেষ রাখতে নেই, তুমি তাদের এখনি কারাগারে নিক্ষেপ কর তারপর তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।

শান্ত হও, আমি যা বলবার জন্যে আপনাদের ডেকেছি আগে তা শেষ করি তারপর তাদের বিচারের ভার আপনাদের হাতেই দোব। এখন আমি যা বলছি আপনারা মন দিয়ে শুনুন। আপনারা কি জানেন কারিয়লের অসুর রাজা সঙ্গর বিরাট এক নৌবাহিনী নিয়ে আটলানটিস আক্রমণ করতে আসছে?

সভায় বিরাট কলরোল উঠলো, নানা বাদ-প্রতিবাদ, নানা প্রশ্ন, প্রচণ্ড উত্তেজনা। আভিতা দু'হাত তুলে তাদের শান্ত হতে বলে বলল, আপনারা চুপ করুন। আপনাদের এই অহেতুক চিৎকার সঙ্গরের কানে প্রবেশ

করলেও সে ভয় পেয়ে ফিরে যাবে না। আপনাদের চিৎকার প্রমাণ করছে যে আপনারা খুব ভয় পেয়েছেন, যাই হোক এখনি ভয় পাবার কিছু ঘটে নি, সঙ্গর আসছে ঠিকই কিন্তু সঙ্গে বিরাট নৌবাহিনী সম্ভবত নেই যাই হোক সে আসছে, তার মুখে অবশ্য শান্তির বাণী কিন্তু বুকে আছে রণ।
সেই ডার্নাল সভায় উপস্থিত ছিল। কোমরে সেই তরবারি, শংকাহীন। উচ্চস্বরে সে বলল, ঘটনাটা আপনি বলুন মহারাণী, আমরা সঙ্গরকে ভয় করি না, আমার এই তরবারি দিয়েই তার তরবারির মোকাবিলা করব।
ঠোঁটে মৃদু হাসি টেনে আভিতা বলল, যাইহোক আমার সভায় অন্ততঃ একজন পুরুষ আছে। শুনুন, সঙ্গর দূত পাঠিয়ে আমার কাছে প্রস্তাব করেছে যে সে আমাকে বিবাহ করতে চায় কিন্তু আমি যদি তাকে বিবাহ করি তাহলে আটলানটিসের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সে আটলানটিস গ্রাস করবে আমরা অসভ্য অসুরদের কবলিত হবো। এটা আপনারা নিশ্চয় চান না।
না না আমরা তা চাই না। সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো। আভিতা আবার আরম্ভ করল: কিন্তু আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারি না তাই আমি সঙ্গরের কাছে পাল্টা প্রস্তাব পাঠিয়েছি যে আমি আমার ভগিনীর সঙ্গে তার বিবাহ দিতে রাজি আছি কারণ আমার পিতা আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন আমি যেন আজীবন কুমারি থাকি।
সভার সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, ভাবটা এমন যেন যাক বাবা আমাকে এখনি যুদ্ধ করতে হচ্ছে না।
কিন্তু ডার্নাল আবার দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করল, কেন মহারাণী আমরা বর্তমানে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই কেন?
ভালো প্রশ্ন করেছ ডার্নাল। ব্যাপারটা হলো কি সঙ্গর অসুর, আমরা তাদের বর্বর মনে করি, ওরা যুদ্ধের রীতিনীতি মেনে চলে না। তারপর সমস্যা হলো তার গুপ্তচরে আমাদের দেশ ছেয়ে গেছে, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে দেশের লোকেরা সঙ্গরের কাছ থেকে প্রচুর উৎকোচ নিয়েছে

এবং তার নির্দেশে যে-কোনো সময়ে তারা নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হবে। তারপর সমস্যা হলো সঙ্গর সমুদ্রের নিচে যে পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তার প্রতিক্রিয়ার ফলে আমাদের শক্তি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, এ তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। অবস্থা এতদূর শোচনীয় যে আমরা আমাদের জাহাজগুলি পূর্ণ শক্তিতে চালাতে পারব না তারপর সঙ্গর ফলাফল না ভেবে পরমাণু অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে।

তাহলে মহারাণী সে তার পরমাণু অস্ত্র নিক্ষেপ করবার আগেই আমরা কারিয়লের ওপর আমাদের পরমাণু অস্ত্র নিক্ষেপ করছি না কেন?

আভিতা বলল, আমাদের বিজ্ঞানীরা বলছেন যে কারিয়লের উত্তরে যে চিরতুষার জমে আছে তা গলে জল হয়ে আমাদের সমুদ্রে প্রবল জলোচ্ছ্বাস ঘটিয়ে যে মহাপ্লাবন সৃষ্টি করবে তার প্রচণ্ড বেগে আমাদের দেশের অনেকাংশ নিমজ্জিত হবে। আমি প্রকাশ্য সভায় আর বেশি কিছু বলতে পারব না কারণ এখানেও সঙ্গর কান পেতে আছে, গুপ্তচরেরা প্রতিটি বাক্য তার কাছে পৌঁছে দেবে।

আভিতা তার কথা শেষ করল। সভায় আবার গণ্ডগোল। কেউ কেউ বলল, সঙ্গর আটলানটায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বন্দী করা হোক, কেউ বলল তাকে জাহাজ থেকে যেন অবতরণ করতে না দেওয়া হয় ইত্যাদি নানা জনে নানা মন্তব্য করল।

আবার আড়ালে কেউ মন্তব্য করল, আরে আমাদের রাণীর যে চরিত্র বলে কিছু নেই তা তো তোমরা জান, আসছে একটা ভিন দেশী রাজা যে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে তাকে কি রাণী একবার যাচাই করে বা চেখে দেখবে না? মুখে তো বলছে ছোটবোনের সঙ্গে বিয়ে দেবে কিন্তু শেষে না নিজেই বিয়ে করে বসে।

রাণী ঘোষণা করল, সঙ্গর আসছে যাইহোক একটা প্রস্তাব নিয়ে, সে আমাদের অতিথি, আমরা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাব এবং আমি আশা করব সঙ্গর যখন শহরে প্রবেশ করবে তখন শহরবাসীরাও তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাবে।

নির্ধারিত তারিখে তবে কিছু বিলম্বে আটলানটা বন্দরে সঙ্গরের পালতোলা জাহাজ "সনজান" ভিড়ল। পশ্চাতে আরও চারখানা জাহাজ এসেছে। সঙ্গরের জাহাজখানাই বড়, বাকিগুলি ছোট।

বন্দর থেকে শহরে প্রবেশ করবার মুখে রাজপথে মস্ত বড় একটা তোরণ নির্মিত হয়েছে, তোরণের মাথায় বড় বড় অক্ষরে লিখে দেওয়া হয়েছে স্বাগতম সম্রাট সঙ্গর। বন্দর থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটি নানাভাবে সাজানো হয়েছে যার মধ্যে ফুলের প্রাধান্যই বেশি। ভিন দেশের অসুর রাজাকে দেখবার জন্যে রাস্তার দু'পাশে নরনারী ও বালক-বালিকার ভিড়।

বন্দরের পাথর বাঁধানো জেটি বিশাল, পাশাপাশি অন্ততঃ কুড়িখানা জাহাজ ভিড়তে পারে।

প্রথমে ভিড়ল সঙ্গরের জাহাজ সনজান তারপর পাশাপাশি বাকি চারটি জাহাজ। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে শিঙা বেজে উঠলো। তারিতাকে সঙ্গে নিয়ে সপারিষদ রাণী আভিতা এগিয়ে গেল। কোমল গালিচা বিছানো হয়েছিল। সঙ্গর নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে শিঙা থেমে গেল কিন্তু অন্য বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠলো। সেই বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ থামিয়ে জনগণ হর্ষধ্বনি করে উঠলো। রাণী এগিয়ে গিয়ে সঙ্গরের হাতে একটি ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। সঙ্গর ফুলের তোড়াটি নিয়ে আভিতার ডান হাত নিজের ডান হাত দিয়ে তুলে নিয়ে চুম্বন করল। তারিতা ভীতা হরিণীর মতো আভিতার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মানুষটাকে দেখতে লাগল।

মানুষটা দেখবার মতো যদিও রূপবান নয়। সুদীর্ঘ দেহ, চওড়া ছাতি, কাঁধ ও কব্জি। দেহবর্ণ বাদামী। মাথার চুল ছোট ও কুঞ্চিত। আটলানটার মানুষদের মতো এরা সুন্দর নয় বিশেষ করে সঙ্গর বা কারও নাকের প্রশংসা করা যায় না। হাজার হোক অসুর তো!

সঙ্গরকে নিয়ে রাণী আভিতা যখন ব্যস্ত তখন অন্য জাহাজ থেকে বেশ

কিছু কারিয়লবাসী নেমে পড়েছে। তারা নামল হুড়মুড় করে, শৃংখলা ভঙ্গ করে রাস্তার ধারে ফলসজ্জা ভাঙতে ভাঙতে এবং অযথা চিৎকার করতে করতে। এরা নাকি সঙ্গরের ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনী। তাদের ব্যবহার দেখে মনে হলো এরা বুঝি দেশটাকে জয় করে নিয়েছে।

সঙ্গরের সঙ্গে এসেছে তার প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি এবং আরও কিছু উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী। সকলের পরিধানে বিভিন্ন উজ্জ্বল বর্ণের পোশাক। প্রত্যেকের কোমরে ছোট তলোয়ার। সকলের মুখে একটা কর্কশ ভাব, কোমলতার সঙ্গে এদের বুঝি বিবাদ।

আভিতার সম্ভাষণ শেষ হলে সঙ্গর বলল, রাণী তোমার রূপের যে প্রশংসা আমি শুনেছি এখন তো দেখছি তুমি তার চেয়েও অনেক বেশি রূপসী, তোমার রূপের তুলনা নেই।

তারিতার সঙ্গে আভিতা অসুর-রাজের পরিচয় করিয়ে দিলো। সঙ্গর তারও হাত তুলে নিয়ে চুম্বন করল।

আভিতা বলল, সমুদ্রযাত্রা করে আপনি ক্লান্ত, এখন আমার প্রাসাদে চলুন, বিশ্রাম করবেন। এখানে সংক্ষিপ্ত আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান-মন্ত্রী ও অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় বিনিময়ের পর শোভাযাত্রা করে সকলে পৃথক পৃথক ঘোড়ায় চেপে প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করল।

সঙ্গর এমন অভ্যর্থনা আশা করে নি। সে অভিভূত।

অসুররা যে আটলানটাবাসীদের তুল্য সভ্য নয় তার পরিচয় সেদিন রাত্রের ভোজসভাতেই পাওয়া গেল। আহারের সময় প্রচলিত রীতিনীতি মানতেও সঙ্গর নারাজ, তার কণ্ঠস্বর কর্কশ, কথা বলার ধরন রুক্ষ। আভিতা ভাবে হাজার হোক অতিথি, সে অভদ্র হলেও আভিতা অভদ্র হতে পারে না।

ভোজসভায় ডার্নাল কিছু একটা কথা আভিতাকে বলতে আসছিল আর ঠিক সেই সময়েই সঙ্গর বুঝি তারিতার দিকে যাচ্ছিল কিন্তু এক অঘটন ঘটল। ডার্নালের সঙ্গে তার মৃদু ধাক্কা লাগল ফলে সঙ্গরের হাতে পান-পাত্র থেকে খানিকটা সুরা সঙ্গরের পোশাকে চলকে পড়ে গেল।

সঙ্গর বিরক্ত হয়ে ডার্নালকে বলল, অসভ্য, বর্বর, চোখে দেখতে পাও না? বেশ জোরেই বলল। সেই সঙ্গে ডার্নালকে একটু ধাক্কাও দিলো। ডার্নাল তো হতবাক। ধাক্কা দেওয়ার জন্যে সে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই সঙ্গরের অভদ্র উক্তিতে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আভিতা সঙ্গরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে এবং সেই গোলমালে তার প্রিয়পাত্র ডার্নাল এবং মহামান্য অতিথি জড়িত বুঝতে পেরে আভিতা এগিয়ে আসছিল। তাকে দেখে সঙ্গর বলল :

রাণী আমি কখনই আশা করি নি তোমার সভায় এমন অসভ্য মানুষ থাকতে পারে? লোকটা কে? ভদ্রতা জানে না? আমাকে ধাক্কা দেয়? আমার পোশাকে মদ ফেলে দিয়েছে, ছিঃ।

ডার্নাল এবং তারিতা দুজনে রীতিমতো বিস্মিত। এমন কুৎসিত ভাষায় অভিযোগ শুনে আভিতার কান লাল হয়ে উঠলো তথাপি সে নিজেকে সংযত করে বলল :

রাজা আমি ওর হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, সত্যি তোমাকে ধাক্কা দেওয়া অন্যায় হয়েছে। ডার্নাল তুমি ভোরবেলায় প্রাসাদ থেকে বাগানে নামবার বড় সিঁড়ির নিচে অপেক্ষা করবে, তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

মাথা নিচু করে রাণীর আদেশ শুনে ডার্নাল স্থান ত্যাগ করবার সময় শুনল, ঠিক হয়েছে, এমন লোক ভোজসভায় না থাকাই উচিত।

এখানেও শেষ নয়। সেই রাত্রেই আরও কয়েকটা কাণ্ড ঘটে গেল। প্রথম-টার সঙ্গে রাণী স্বয়ং জড়িত।

সেদিন ভোজসভায় সম্মানিত অতিথির জন্য অন্য স্থানের আলো বন্ধ রেখে এখানে প্রচুর আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়া বিশেষ ভোজ ব্যতীত অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্যে নৃত্যগীত ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রাণী ও তার বোন সেজেছিল বিশেষভাবে। রাণী পরেছিল বক্ষযুগল আবৃত এবং গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলওয়ালা রেশমের একটি পোশাক, ধবধবে সাদা। বুকের উপরিভাগ অনাবৃত, কণ্ঠে সঙ্গর প্রদত্ত সেই নেকলেস, মাথায় ফুলের

মালা। আর কোনো আভরণ নেই।

তারিতারও একই পোশাক তবে সেটির রং লাল। তারও গলায় রত্নখচিত নেকলেস, মাথায় ফুলের মালা।

ভোজসভার একধারে ছোট একটি মঞ্চ স্থাপিত হয়েছে। সামনে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে পুরু ও কোমল গালিচা। গালিচার নিচে পাতা আছে গদি। অতিথি ও অভ্যাগতরা হাতে সুরাপাত্র নিয়ে একে একে গালিচার ওপর আসন গ্রহণ করল।

প্রথমে আরম্ভ হলো একটি যুবক ও যুবতীর যুগল নৃত্য, বিরল বাস কিন্তু ফুলের গহনা অনাবৃত অংশের অনেকটা আবৃত করে দিয়েছে। ওরা দুজনে ভারী সুন্দর নাচছে, বিকৃত রুচির নাচ নয়, অশ্লীলতার ইঙ্গিত কোথাও নেই।

সঙ্গর হাতে সুরার পাত্র নিয়ে আভিতার পাশে বসে নাচ দেখছে। আভিতার হাতে সুরাপাত্র নেই, আছে একটি ফুল। অদূরে তারিতা ও তার সঙ্গিনী লোটি। তাদের কাছেই বসেছে সঙ্গরের সেনাপতি আটন। মানুষ তো নয় যেন একটা ভাল্লুক। হাত ও পায়ের যেটুকু বেরিয়ে আছে তা ঘন লোমে আবৃত। মুখখানা মস্তবড়, হাঁড়ির মতো, চ্যাপ্টা নাক, পুরু ঠোঁট। দেখতে কুশ্রী। এখনও পর্যন্ত আটলানটার কোনো মেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে নি। আটন যে মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে গেছে সেই মেয়ে ভয় পেয়ে কোনো আছিলা করে স্থান ত্যাগ করেছে।

যুবক-যুবতীর যুগল নৃত্য ও তালে তালে সঙ্গীত যখন বেশ জমে উঠেছে সেই সময়ে সব আলো দপ্ করে নিবে গেল। আলো নিবে যেতেই আভিতা তার বোনের নাম ধরে ডেকে তার কাছে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। কে তাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের বসনে টান দিয়ে তাকে গালিচার ওপর ফেলে দিয়ে তাকে উন্মত্তের মতো চুম্বন করতে লাগল, মুখে, গলায়, কাঁধে, বুকে। আভিতার নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে, সে হাঁফাতে লাগল, চেষ্টা করেও চিৎকার করতে পারল না, ওদিকে তার দেহ থেকে তার পোশাক বুঝি কেউ খুলে দিচ্ছে। আভিতা কিছুতেই সেই পুরুষের আলি-

ঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারল না।

আরও কিছু হয়ে যেত হয়তো। তার পোষাকটাই বুঝি দেহচ্যুত হয়ে যেত কিন্তু এই সময় আলো জ্বলে উঠলো। আভিতা সভয়ে দেখল তার বুকের ওপর হাত রেখে তার দিকে চেয়ে নির্লজ্জের মতো হাসছে অসুর-রাজ সঙ্গর।

হাত সরাও, সরে যাও, আভিতা আদেশ করল। সঙ্গর হয়তো ভাবল বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তাই সে সরে গেল সেইরকম নির্লজ্জের মতো হাসতে হাসতে। চোখে একটা বিশেষ ইঙ্গিত, তুমি তো আমারই হবে মেয়ে শুধু দুদিন আগে আর পরে।

আলো জ্বলল। নতুন অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। কয়েকজন তরুণ তরুণী নানারকম দৈহিক কসরৎ দেখাতে লাগল সঙ্গীতের তালে তালে। তাদের ওপর নানা বর্ণের আলো পড়ছে, সকলেই উপভোগ করছে।

হঠাৎ নারীকণ্ঠে চিৎকার। আভিতা এবং কাছাকাছি সকলেই দেখল সঙ্গরের সেনাপতি ভালুক দৃশ সেই মানুষটা আটন তারিতার সঙ্গিণী লোটিকে টেনে নিয়ে তার কোলের ওপর শুইয়ে ঝুঁকে পড়ে তার মুখের দিকে চেয়ে পাগলের মতো হাসছে।

এই দৃশ্য দেখে আভিতা ক্ষেপে গেল, বলল, সঙ্গর এই বুঝি তোমাদের দেশের রীতি? রাজার সামনেই তার সেনাপতি অচেনা যুবতীকে লাঞ্ছিত করে?

সঙ্গর হো হো করে হেসে উঠলো।

আভিতার মুখ টকটকে লাল, প্রায় চিৎকার করে বলল, জানোয়ারটাকে বলো মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে।

এটা কি হলো রাণী, তুমি আমার সেনাপতিকে জানোয়ার বললে, আচ্ছা আচ্ছা তোমার সম্মান রাখতেই বলছি, এই আটন, ছেড়ে দাও এটা মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার জায়গা নয়।

আভিতা আর বসল না। সে তার বোন, তারিতা, লোটি ও অন্যান্য যুবতীদের সঙ্গে নিয়ে সভা ত্যাগ করে চলে গেল। এরপর অবশ্য আমোদ-প্রমোদ

আর জমে নি।

শয়নকক্ষের দিকে যেতে যেতে তারিতা বলল, দিদি তুই পশুটার সঙ্গে আমার বিয়ে দিবি? ওতো এখানে এসেই তোকে অপমান করল! ওরা বর্বর ওদের সঙ্গে আমাদের মিলবে না। ওর সঙ্গে যদি তুই আমার বিয়ে দিস তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।

সঙ্গরকে আভিতা চিনতে পেরেছে। সভ্যতায় ওরা এখনও অনেক পেছিয়ে আছে, এখনও ওরা বর্বর স্তরে আছে। সত্যিই তারিতার মতো সভ্য ওরুচি-শীল এবং কোমল মেয়ে সঙ্গরের উৎপীড়ন সহ্য করতে পারবে না। সঙ্গরের ইন্দ্রিয় প্রবল, সে হয়তো তারিতাকে কোনোদিন পিষে ফেলবে।

আভিতা তখন বোনকে পাশে বসিয়ে তার দেশের সমস্যার কথা বলল। আভিতা বলল এখনি সে সঙ্গরের সঙ্গে সংগ্রামে নামতে পারছে না। আগে তার দেশকে চক্রান্তকারীদের কব্জা থেকে মুক্ত করতে হবে। তার-পর দেশের শক্তি উৎপাদন আগেকার স্তরে ফিরিয়ে আনতে হবে। ততদিন সে যুদ্ধ করতে পারবে না।

তাহলে কি দিদি তুই আমায় বলি দিবি?

না, শোন, আমি তো সঙ্গরের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি যে তোর সঙ্গে ওর বিয়ে দোব তাছাড়া, কয়েকদিন আগে আমাদের সভাতেও একথা ঘোষণা করেছি এখন হঠাৎ আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিলে সঙ্গর একটা গোলমাল বাধাতে পারে।

তাহলে কি হবে? ওটা যে একটা নরপশু।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু আমার একটু সময় দরকার কিংবা অন্য একটা পন্থা, হ্যাঁ অন্য একটা পন্থা। শোন্ তারিতা কালকে সঙ্গরের সঙ্গে তোর বাকদানের কথা ঘোষণা করার জন্যে সভা ডাকা হয়েছে। শুধুই বাকদান ঘোষণা করা হবে, বিয়ের তারিখ হয়তো আরও পরে ঘোষণা করা হবে, ধর বিয়ের তারিখ ঘোষণা করা হলো ছ'মাস পরে তাহলে আমি বেশ কিছু সময় পেলুম ইতিমধ্যে যা করার তা আমি করব।

কি করবি? তুই আর একটা কি ভাবছিস, বল্ না রে।

না আমি এখন বলব না, তুই যা রাত্রি হয়েছে, ঘুমোগে যা, যাবার আগে মাহাশানকে একটা খবর পাঠিয়ে দিস সে যেন এখনি আমার সঙ্গে দেখা করে।

তারিতা চলে গেল। ভীষণ গরম, বাতাস নেই। আভিতা তার দেহ থেকে সমস্ত বসন খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। একজন ক্রীতদাসী তাকে হাওয়া করতে লাগল, আর একজন ক্রীতদাসী ভিজে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে তার সারা শরীর মুছিয়ে কিছু সূক্ষ্ম চূর্ণ তার দেহে ছড়িয়ে দিলো। আভিতা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলওয়ালা হস্তবিহীন ছোট একটা জামা গায়ে দিয়ে মাহাশানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

মাহাশান আসতেই আভিতা ক্রীতদাসীদের ঘর থেকে বার করে দিলো। ভোজসভায় সঙ্গর ও তার সেনাপতি আটনের অসভ্য ব্যবহার মাহাশানকেও ভাবিয়ে তুলেছে। সেও ভাবছে কি করে এই বর্বরদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

মাহাশান বোসো, তুমি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত, কিছুক্ষণ যদি পুনর্নব প্রকোষ্ঠে অতিবাহিত করে আসতে পার তাহলে শ্রান্তি দূর হবে।

পরে হবে আভিতা, আজ বড় গরম তাছাড়া এই প্রাসাদের আবহাওয়া এতদূর দূষিত হয়েছে যে নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

মাহাশান মনে মনে আমিও খুব পীড়িত, প্রাসাদের কোণে কোণে চক্রান্ত, তুমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার সন্দেহ হচ্ছে ওরা যে-কোনো সময়ে তোমাকে ও আমাকে হত্যা করতে পারে।

আমি নিহত হলে কোনো খেদ নেই মা কিন্তু তুমি নিহত হলে এই সোনার রাজ্য ছারেখারে যাবে।

শোনো মাহাশান এখন খেদ করার সময় নেই, এখন কাজের সময়, ওরা আঘাত করবার পূর্বেই আমি ওদের আঘাত করতে চাই, তুমি কি বলতে পার প্রাসাদ রক্ষীর সকলে আমার অনুগত ?

রক্ষীদের নেতা টেলেমাস ব্যতীত কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

তাহলে ? আমার ধারণা ছিল অন্যরকম।

সে ধারণা তুমি বদলাও। সঙ্গর, আটন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা এমন ব্যবহার করছে যেন তারা দেশটা জয় করেছে, তারাই যেন কর্তা, কি করবে তুমি? কিছু স্থির করেছ। আমি তো এখন সেনানায়কদেরও বিশ্বাস করছি না, তারা তো একজন নারীকে দেশের সর্বপ্রধান বলে মেনে নিতে রাজি নয়।

আমি তা জানি। শোনো মাহাশান, আমি স্থির করেছি আমি সঙ্গরকে হত্যা করব ও আমাকে হত্যা করবার আগেই।

সেকি ? তুমি অতিথিকে হত্যা করবে ? এ যে ঘোর পাপ হবে।

তাহলে তো আমাকে মরতে হবে, তা হয় না মাহাশান। আগামীকাল সঙ্গর তার সনজান জাহাজে আমাদের নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেছে, তারপর নৃত্যগীতেরও আয়োজন করেছে। আমার সন্দেহ কালই আমাদের একজনের শেষ রজনী, এই পৃথিবীতে হয় আমি থাকব কিংবা সঙ্গর থাকবে।

তুমি দেশের রাণী, যা ভালো বোঝো কর, আমার যদি কিছু কর্তব্য থাকে তো বলো।

বলছি, আমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে তুমি যেভাবে পার আমাদের পরমাণু অস্ত্রগুলির বিস্ফোরণ ঘটাবে। তুমি তো জান আমার এই শয়নকক্ষের পাশে এই যে ছোট ঘরটি রয়েছে সেই ঘরে যে অ্যাগেট নির্মিত তিনটি বোতাম রয়েছে সেই তিনটি বোতাম টিপলে আটলানটার বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত কয়েকটি পরমাণু অস্ত্র বিস্ফোরিত হবে। আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন আটলানটিসও শেষ হয়ে যায়। তুমি কাল শরীর অসুস্থ এই অছিলায় সঙ্গরের সনজান জাহাজে নৈশভোজে যেয়ো না। তুমি আমার শয়নকক্ষে লুকিয়ে থাকবে। আমার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি তোমার কাজ করবে। উঃ আজ বড় গরম যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, সামান্য এই জামাটাও আমি গায়ে রাখতে পারছি না। তুমি যাও মাহাশান। আমি একবার আমার সেই স্ফটিকখণ্ড বার করে দেখবার চেষ্টা করব আমাদের ষড়যন্ত্রকারীদের কাউকে দেখতে পাই কি না।

মাহাশান চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আভিতা জামাটা তার দেহ থেকে টান

মেরে ফেলে দিলো তারপর উত্তর দিকের দেওয়ালে গেল। এই দেওয়ালে আছে একটি লুক্কায়িত সিন্দুক। দেওয়ালের বিশেষ এক স্থানে চাপ দিলে সিন্দুকের দরজা খুলে যায়। এই গুপ্ত সিন্দুক ও স্ফটিকের কথা অল্প কয়েক-জনেই জানে তারমধ্যে আভিতার দু' একজন ক্রীতদাসীও জানে।

দেওয়ালের বিশেষ স্থানটিতে আভিতা চাপ দিলো। সিন্দুকের দরজা খুলে গেল। সিন্দুকের ভেতর হাত বাড়িয়ে আভিতা স্ফটিকের আধারটি বার করল। একি হালকা মনে হচ্ছে কেন? আধার খুলে দেখল আধার শূন্য। স্ফটিক চুরি হয়ে গেছে।

আভিতা এই রাত্রে সোরগোল তুলল না। শূন্য আধার তুলে রাখল, সিন্দুক বন্ধ করে দিলো। তারপর হাতে তালি বাজাল। একজন ক্রীতদাসী ছুটে এলো। তাকে বাতাস করতে বলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এলো না। কাল সকালে বিশেষ সভায় তারিতার বাকদান ঘোষণা করতে হবে। সেই কথাই চিন্তা করতে লাগল।

আভিতা যখন তার শয়নকক্ষে তার প্রধানমন্ত্রী মাহাশানের সঙ্গে গোপন আলোচনা করছিল ঠিক সেই সময়েই প্রাসাদের এক প্রান্ত যেখানে সঙ্গর ও তার প্রধান সেনাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেইখানে একটি ঘরে সঙ্গর তার প্রধানমন্ত্রী টুথমুথু এবং প্রধান সেনাপতি আটনের সঙ্গে পরামর্শে ব্যস্ত। ওরা তিনজন ছাড়া রাণী আভিতার দুজন মন্ত্রীও রয়েছে।

সেই মন্ত্রী দু'জন সঙ্গরকে জানাল যে সৈন্য ও নৌবাহিনী রাণীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এছাড়া আমরা দায়িত্বপূর্ণ প্রায় সকল ব্যক্তিকেই কিনে ফেলেছি। আমরা কেউ রাণী চাই না, আমরা চাই একজন রাজা এবং তুমিই উপযুক্ত লোক। আমরা অবশ্য মাহাশানকে কিনতে পারি নি কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এছাড়া আমরা আর একটা জিনিস এখনও জানতে পারি নি সে হলো প্রাসাদের কোনো এক গোপন প্রকোষ্ঠে কোথাও কয়েকটা চাবি আছে যেগুলো ঘোরালে বারো জায়গায় রক্ষিত বারোটি পরমাণু অস্ত্র এক

সঙ্গে বিস্ফোরিত হবে।

সঙ্গর বলল, এখন মাহাশান বা পরমাণু অস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন দেখছি না। তোমরা বলো আমি কি করব।

তুমি কাল তোমার জাহাজে নৈশভোজের যে আয়োজন করেছ সেই নৈশ-ভোজের এক সময়ে তুমি রাণীকে কোনো গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে শুধু জলে ফেলে দেবে।

তাহলে জাহাজ বন্দর থেকে কিছু দূরে নিয়ে যেতে হবে, সঙ্গর বলল।

প্রধানমন্ত্রী বলল, সে তো নিশ্চয়, বন্দরের কাছে জলে পড়লে তো রাণী সাঁতার কেটে তীরে উঠে আসবে। রাণীকে তুমি জলে ফেলে দিয়েই জাহাজ ফেরাতে বলবে।

রাণীর একজন মন্ত্রী বলল, আমরা শহরে ফিরে এসে বলব রাণীকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, রাণী নিরুদ্দেশ আর ঠিক সেই সময়ে তুমি সদলে প্রবেশ করবে।

কিন্তু দেখ, সঙ্গর বলল, আভিতাকে আমার রাণী করতে ইচ্ছে, তাকে হত্যা করবার আমার মোটেই আগ্রহ নেই তার চেয়ে আমি যদি তাকে আমার জাহাজেই লুকিয়ে রাখি তাহলেও তো আমাদের একই উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সেনাপতি আটন বলল, তাহলে তারিতাকে আমাকে দিতে হবে।

তুমি থাম আটন, তুমি একটা বর্বর, তোমার হাতে আমি তারিতাকে দিতে পারি না, তুমি ওকে এক রাত্রে পিষে মেরে ফেলবে, আগে আটলানটিসের সিংহাসনে বসি তারপর তার বিচার হবে। তুমি বরঞ্চ কাল সকালে জাহাজে গিয়ে একটা ঘর ভালো করে সাজিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করবে, সেই ঘরে আভিতাকে বন্দী করে রাখা হবে।

প্রধানমন্ত্রী টুথমুথু বলল, কিন্তু রাণী যদি তোমাকে হত্যা করে?

সঙ্গর হো হো করে হেসে উঠলো। হাসি থামিয়ে বলল, সে সুযোগ তাকে দেওয়া হবে না। ঠিক আছে, আজ অনেক রাত্রি হয়ে গেল। তোমরা বিশ্রাম

করগে যাও, কাল সকালে আবার রাণীর সভায় যেতে হবে।
একে একে সকলে বিদায় নিল। দু'জন ক্রীতদাস সঙ্গরকে বাতাস করতে লাগল। সে হাই তুলে নিজের মনে হাসতে হাসতে শয্যা গ্রহণ করল।

সারারাত্রি আভিতার ভালো ঘুম হলো না। ভোর হবার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। শরীরে প্রচুর ক্লান্তি। সভায় যাবার আগে অন্ততঃ এক ঘণ্টা সে পুনর্নব প্রকোষ্ঠে অতিবাহিত করবে তাহলে প্রকোষ্ঠে রক্ষিত লাল বর্ণের স্ফটিক থেকে নির্গত অদৃশ্য রশ্মি তার দেহ মন তাজা করে দেবে।
যে জামাটা কাল রাত্রে ফেলে দিয়েছিল সেই জামাটা পরে নিয়ে আর্শিতে একবার মুখ দেখে চুলটা ঠিক করে উদ্যানের দিকে রওনা হলো। মারবেল পাথরের চওড়া সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই ডার্নালকে দেখতে পেল। একটা গাছের নিচে বেদীতে সে বসেছিল। আভিতাকে দেখে সে ত্বরিতে উঠে এলো।
তখনও আবছায়া অন্ধকার রয়েছে, রাত্রি অপেক্ষা এখন ঠাণ্ডা, মৃদু বাতাস বইছে।
কখন এলে ডার্নাল?
আমি সারারাত্রি ঐ বেদীতেই শুয়ে সিঁড়ির দিকে লক্ষ্য রাখছিলুম, কোনো গুপ্তঘাতক ওপরে উঠছে কি না।
আভিতা যখন সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমেছে তখন সিঁড়ির মাথায় আর এক-জন এসে দাঁড়িয়েছিল। সে সঙ্গর। সঙ্গর ঠাণ্ডা দেশের মানুষ, রাত্রে গরমে তারও ঘুম হয় নি। শেষ রাত্রে শীতল বাতাস উপভোগ করবার জন্যে সে ঘরের বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল।
চওড়া লম্বা বারান্দা, এধার থেকে ওধার দেখা যায় না। ঘর থেকে বেরিয়ে সঙ্গর আবছা আলোয় দেখল দূরে একটা দরজা দিয়ে হ্রস্ব জামা পরে এক-জন সুন্দরী বারান্দায় বেরিয়ে এসে কোনো দিকে না চেয়ে সিঁড়ির দিকে চলল। সঙ্গর একটা থামের আড়ালে লুকলো।
দূর থেকে হলেও আভিতাকে সে চিনতে পেরেছে। ভোররাত্রে আভিতা

কোথায় যাচ্ছে ? তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল গত রাত্রে নৈশভোজের সময় ডার্নাল নামে যে যুবক তাকে ধাক্কা দিয়েছিল তাকেই আভিতা এই সময় উদ্যানে সিঁড়ির নিচে অপেক্ষা করতে বলেছিল শাস্তি দেবার জন্যে। দেখা যাক রাণী কি শাস্তি কিভাবে দেয় ?

আভিতা উদ্যানে নেমে যেতে সঙ্গর সিঁড়ির মাথায় এসে একটা থামের আড়াল থেকে ওদের দেখতে লাগল। সঙ্গর শুনতে পেল ওরা দুজনে কথা বলছে। হাওয়ায় কিছু শব্দ ভেসে আসছিল, কান পাতলে শোনা যায় কিন্তু যে ভাষায় ওরা কথা বলছে সে ভাষা সঙ্গর জানে না।

আভিতা ও ডার্নাল বাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। কয়েক পা যাবার পর ডার্নাল রাণীর কোমর জড়িয়ে ধরল আর রাণী ডার্নালের কাঁধে একটা হাত তুলে দিলো। এই বুঝি শাস্তি দেওয়ার বহর! ডার্নাল তো রাণীর প্রেমিক দেখছি। বাঃ বেশ মজা তো! এই মেয়েকে আমি রাণী করতে চাইছি ? তাতে ক্ষতি কি ? আমিও তো সচ্চরিত্র পুরুষ নই। আমার উদ্দেশ্য সফল হলেই হলো। সঙ্গর নিজের ঘরে ফিরে এলো।

বাগানের ভেতরে একটা মধুকুঞ্জ আছে। ওরা সেইখানে গিয়ে পাশাপাশি বসল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর রাণী বলল :

ডার্নাল দরকার হলে তুমি মরতে পারবে ?

আভিতার হাত চেপে ধরে ডার্নাল বলল, একমাত্র তোমার জন্যেই আমি আমার প্রাণ দিতে পারি।

পার ? তাহলে শোনো, কাল তোমাকে সঙ্গরকে হত্যা করতে হবে। আজ রাত্রে সঙ্গরের জাহাজে আমাদের নিমন্ত্রণ, তুমি আমার রক্ষী হয়ে যাবে তবে তোমাকে ছদ্মবেশ নিতে হবে; তুমি জাহাজে আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবে। আমি সঙ্গরকে জাহাজের ওপরে একটা নিভৃত স্থানে নিয়ে যাব এবং সঙ্গর যাতে আমাকে আলিঙ্গন করে আমি তাকে সেই ভাবে প্রলোভিত করব ও সেই সঙ্গে তোমাকে ইশারা করব। গুপ্তস্থান থেকে ছুটে এসে তুমি তাকে হত্যা করে লাশটা জলে ফেলে দেবে। সঙ্গরের রক্ষীরা যদি তোমাকে দেখে ফেলে তাহলে তারা তোমাকে নিহত করতে

পারে, সেজন্যে প্রস্তুত থেকো।

তুমি নিশ্চিন্ত থাক রাণী, আমি অক্ষরে অক্ষরে তোমার আদেশ পালন করব।

আভিতা বলল, নৈশভোজে যাবার আগে আমি একটা চক্রান্ত করব। আমার একটা আংটি আছে। সেই আংটিতে যে পাথর বসানো আছে সেই পাথরটি অত্যন্ত বিষাক্ত। ভিজে ঠোঁটে স্পর্শ করলে মৃত্যু তবে সঙ্গে সঙ্গে নয়, অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে। সেই আংটি যদি সুরায় ডোবানো যায় এবং সেই সুরা কেউ পান করে তারও একঘণ্টা পরে মৃত্যু হবে। সঙ্গর ভীষণ চতুর তাকে এভাবে হত্যা করা যাবে না। আমি নৈশভোজে যাবার আগে দাসীরা যখন আমাকে সাজিয়ে দেবে তখন তাদের সামনেই আমি আংটিটি পরে বলব এই বিষ আংটি আমি সুরায় ডুবিয়ে দোব এবং সেই সুরা সঙ্গরকে পান করাব। আমাদের দাসীদের মধ্যে সঙ্গরের চর আছে। একথা ঠিক সঙ্গরের কাছে পৌঁছে যাবে।

ডার্নাল বলল, তোমার অন্য একটা মতলব আছে মনে হচ্ছে কারণ সঙ্গরকে হত্যা করবার ভার তো আমাকে দিচ্ছ, তাহলে ?

আমার শিকার হবে সঙ্গরের প্রধানমন্ত্রী টুথমুথু আর তার প্রধান সেনাপতি আটন। তাদের আমি বিষ খাইয়ে সঙ্গরকে নিয়ে জাহাজের ওপরে যাব। আমি চাই সঙ্গর আমার আংটির দিকে নজর রাখবে কিন্তু তাকে যে অন্য-ভাবে হত্যা করার মতলব এঁটেছি সেটা তাকে জানতে দিতে চাই না। তবে এমনও করতে পারি সে যখন আমাকে আলিঙ্গন করবে সেই সময়ে যদি আমি আংটির পাথরটা ওর ঠোঁটে একবার চেপে ধরতে পারি তাহলে তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। একঘণ্টা পরে যখন তিনজনের মৃত্যু হবে তখন কেউ বুঝতেও পারবে না কিসে তাদের মৃত্যু হলো। তাহলে তুমি প্রস্তুত থেকো। তোমার ছদ্মবেশের উপকরণ আমি যথাসময়ে পাঠিয়ে দোব।

ডার্নালের কোলে মাথা রেখে আভিতা শুয়ে পড়ল তারপর বলল, তুমি যদি কার্যোদ্ধার করে বেঁচে যাও তাহলে তোমার সঙ্গে আমি তারিতার

বিয়ে দোব।
ডার্নাল কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে আভিতাকে চুম্বন করল। এমন সময় পাখি ডেকে উঠলো। আভিতা উঠে বসে বলল, সকাল হলো আমি যাই। দেহ মর্দন করিয়ে স্নান করব তারপর পুনর্নব প্রকোষ্ঠে কিছু-কাল অতিবাহিত করে সাজসজ্জা করে সভায় যেতে হবে। আজ যে তারিতার বাকদান ঘোষণা করব।
তুমি দেখছি কূটনীতিতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছ। আভিতা মৃদু হাসল তারপর ডার্নালের চুল ধরে টেনে দিয়ে দ্রুতপদে প্রাসাদের দিকে ফিরে এলো।

সমস্ত সভাটা সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। রাণী আভিতা এবং তার বোন তারিতাও বিশেষভাবে সেজে দু'জনে পাশাপাশি সভা আলো করে বসেছে। অদূরে একটি রত্নখচিত চেয়ারে সঙ্গরকে বসানো হয়েছে। সেও বিশেষভাবে সেজেছে। প্রাসাদের তোরণ দ্বারে বাদ্যবৃন্দ মধুর সঙ্গীত ছড়িয়ে দিচ্ছে।
সকলে এসে গেছেন। সভার একধারে বসে চক্রান্তকারীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, রাণী সিংহাসনে আজই তোমার শেষ দিন। যা পার আজ করে নাও। কাল থেকে তোমার লীলাখেলা শেষ। মেয়ে আবার দেশ শাসন করবে? আস্পর্ধা তো কম নয়।
আভিতা ও তারিতার পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মাহাশান। মাথায় থাকথাক চুল, দাড়ি ও গোঁফ সব রুপোর মতো সাদা। কালো একটা পোশাক পরেছেন তাতে তাঁর শুভ্র দেহবর্ণ আরও ফুটে উঠেছে। দেখলে মনে শ্রদ্ধা জাগে। মাথা নিচু করে আভিতাকে কিছু বললেন।
আভিতা উঠে দাঁড়াল। সভা শান্ত হলো। রাণী কি বলেন শোনবার জন্যে সকলে উদগ্রীব।
রাণী উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গরের দিকে চেয়ে বৃথা কালক্ষেপ না করে এবং ভূমিকা না করে বলল:
মহামান্য অতিথি আপনি আমাকে বিবাহ করবার একটা প্রস্তাব পাঠিয়ে

আমাকে সম্মানিত করেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমি সে সম্মানের যোগ্য নই, আমি আপনার মহিষী হবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তাছাড়া আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড় এবং আমার পিতা আমাকে আদেশ করে গেছেন আমি যেন কুমারি থাকি। সেই আদেশ আমি মেনে নিয়েছি।

সঙ্গর উঠে দাঁড়িয়ে একটা ধাপের ওপর ডান পা তুলে দিয়ে কোমরে দুই হাত রেখে বলল : তাহলে রানী আপনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন ?

আমি কারণগুলি বলেছি এবং আমি একটি পালটা প্রস্তাব করছি আপনি তা গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করবেন। আপনি আমার এই ভগিনী তারিতাকে আপনার সম্রাজ্ঞীরূপে গ্রহণ করুন। তারিতা রূপে ও গুণে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

সভার সকলে হর্ষধ্বনি করে উঠলো এবং সঙ্গর কিছু বলার আগেই তারা এই প্রস্তাব সমর্থন করল।

সঙ্গর হাত তুলে সকলকে শান্ত হতে বলল। সভা শান্ত হলে সে বলল, এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে কি যৌতুক দেবেন ?

আমি আপনাকে কিছু দোব না কিন্তু আপনাদের পুত্রকে আমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় এই আমার জন্মভূমি আটলানটিসকে দোব। আশা করি আপনার আর আপত্তি করার কোনো কারণ নেই।

সভার সকলে আবার হর্ষধ্বনি করে উঠলো। সঙ্গর এগিয়ে এসে তারিতার ডান হাতে নিজের ওষ্ঠ স্পর্শ করে বলল, বেশ আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলুম। আপনারই জয় হলো।

এবার তুমুল হর্ষধ্বনি। তারিতা দিদির কোলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। আভিতা তার কানে কানে বলল : ভয় পাচ্ছিস কেন ? বর্বরটার জীবন আজই শেষ হবে তারপর তোর সঙ্গে আমি ডার্নালের বিয়ে দোব।

অমনি মুখ তুলে তারিতা চোখ মুছে হেসে দিদির গালে চুমু খেয়ে বলল, জানিস দিদি ডার্নালকে আমি ভালবাসি তবে দূর থেকে।

তারিতার হাসি দেখে সভার সকলে ভাবল তারিতা বুঝি এই প্রস্তাবে

খুব খুশি হয়েছে। তারা আর এক প্রস্থ হর্ষধ্বনি করল।

কি আশ্চর্য! সেদিন সূর্যাস্তের আগেই আটলানটার আকাশ থেকে পাপের বোঝার মতো সেই কুয়াশা সরে গেল। জোরে বাতাস বইতে লাগল। শক্তি উৎপাদনের সমস্ত কেন্দ্রগুলি জোর কদমে চলতে লাগল।

শহরের সকল নরনারী নানারকম বেশভূষা পরে হাসিমুখে হাত ধরাধরি করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলো। শালীনতার সকল বাঁধ ভেঙে তারা নৃত্য করতে আরম্ভ করল।

সন্ধ্যা হতেই নৈশভোজে যাবার জন্যে আভিতা প্রস্তুত হলো। ডার্নালের কাছে সে ছদ্মবেশের উপকরণ আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাকে তো চেনাই যায় না, এমন কি মাথার চুলের রং ও গাত্রবর্ণও পালটে গেছে। দুই চোখ যেন আরও ছোট হয়ে গেছে। উন্নত নাশা যেন চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। কোমরে ছোট একটি তরবারি গুঁজে সে বাইরে রাণীর জন্যে অপেক্ষা করছে।

সকালে আভিতা এক ঘণ্টা পুনর্নব প্রকোষ্ঠে অতিবাহিত করেছিল। তার রাত্রি জাগরণের সব ক্লান্তি দূর হয়েছিল, রক্তে নতুন চাঞ্চল্য সঞ্চারিত হয়েছিল এবং গাত্রবর্ণও উজ্জ্বল হয়েছিল। নৈশভোজে যাবার জন্যে আভিতা সেজেছিলও অনন্যরূপে। এ যেন নতুন এক আভিতা। এরূপের তুলনা নেই। সেই বিষ আংটি পরতে ভোলে নি।

সঙ্গরের জাহাজ সনজান-এ পৌঁছে দেখল নানারকম আলো, পতাকা ও ফুলে জাহাজখানি অতি চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে। মনে হয় আটলানটার কোনো শিল্পী জাহাজখানি সাজিয়ে দিয়েছে।

সঙ্গর এগিয়ে এসে রাণীকে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর তার কনুই ধরে তাকে জাহাজে নিয়ে বিশেষভাবে সজ্জিত আসনে বসাল। সঙ্গে সঙ্গে পানীয় এলো। রাণী পানপাত্র তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গরও একটি পানপাত্র তুলে নিল।

আভিতা বুঝল সঙ্গরের কানে খবর পৌঁছে গেছে। পাছে আভিতা তার

পানপাত্রে বিষ আংটি ডুবিয়ে দেয় এই আশংকায় সে দ্রুত পানপাত্র তুলে নিল।

কাছেই দাঁড়িয়ে আছে টুথমুথু ও আটন। তারাও এখনি পানপাত্র তুলে নেবে কিন্তু আতর্কিতে একটা সুযোগ হলো। বাতাস তো বিকেল থেকে জোরে বইছিল এখন হঠাৎ যেন ঝড় উঠলো। জাহাজ দুলে উঠলো। আভিতা ব্যতীত সকলে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা নিজেদের ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যস্ত, কেউ কেউ আকাশের দিকে চাইল আর সেই সুযোগে বাকি চারটি গেলাসেই আভিতা তার আংটি ডুবিয়ে দিলো।

ঝড় যেমন অতর্কিতে এসেছিল তেমনি অতর্কিতে কমে গেল। আটন, টুথমুথু এবং আরও দুজন পানপাত্র তুলে নিল। তারা সকলে অন্যমনস্ক ছিল অতএব সেই ফাঁকে আভিতা কি করছে তারা দেখে নি।

সঙ্গর আভিতাকে বলল, পান শেষ করে চল রাণী আমরা জাহাজের অন্য এক প্রান্তে সেখানে তোমার মনোরঞ্জনের জন্যে নৃত্যগীতের আয়োজন করেছি, একটু দেখবে চল তারপর একত্রে ভোজনে বসা যাবে কি বলো?

আমি তোমার অতিথি, আমি তোমার সব অনুরোধ রক্ষা করব।

ছোট একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। আগে থেকেই কিছু বাজনা বাজছিল এখন কয়েকটি রঙিন আলো জ্বলে উঠলো। আভিতা আসন গ্রহণ করল। প্রথমে একটি কুস্তি দেখান হলো। তারপর সমবেত নৃত্য কিন্তু এরপর যা আরম্ভ হলো তার জন্যে আভিতা প্রস্তুত ছিল না।

প্রথমে একটি পরিণত যুবতী নাচতে নাচতে মঞ্চে প্রবেশ করল। সম্পূর্ণ নিরাবরণ। নাচতে নাচতে সে যেন কাকে আহ্বান করল। কোথা থেকে একটি যুবক নর্তক এসে যেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেও সম্পূর্ণ নিরাবরণ। তারা দুজনে অত্যন্ত অশ্লীল ভাবভঙ্গি সহকারে নাচতে লাগল। আভিতার জন্য গা গুলিয়ে উঠলো। সঙ্গর পাশেই বসেছিল। তাকে বলল, আমার ভালো লাগছে না, এখানে হাওয়া কম, চল জাহাজের ওপরে যাই।

সঙ্গর সঙ্গে সঙ্গে রাজি। সেও সুযোগ খুঁজছিল আভিতাকে কোথাও একটু নির্জনে নিয়ে যাবে। ওরা দুজন আসন ত্যাগ করল। আভিতা অনুভব

করল জাহাজ চলছে। এতক্ষণ যেখানে বসেছিল সেখানকার কান ফাটানো আওয়াজে সে বুঝতে পারে নি যে জাহাজ চলছে। কেন চলছে কে জানে। আভিতা কিছু জিজ্ঞাসা করল না।

আভিতা ও সঙ্গর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ডার্নালও উঠে পড়ল। ওরা এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ডার্নাল দূরে থেকে ওদের অনুসরণ করতে লাগল।

সঙ্গর ওকে জাহাজের ওপরে নিয়ে এলো। কুয়াশা কেটে গেছে, আকাশ নির্মেঘ, আকাশে চাঁদ উঠেছে। দুজনে পায়চারি করছে। সঙ্গর বলল, কি সুন্দর দেখ আভিতা। আমাদের জন্যেই বুঝি আজ কুয়াশা কেটে গেল, আজ রাত্রিটা আমাদের।

ডার্নাল মোটা কাছির একটা স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওদের দিকে নিবদ্ধ। ওরা তিনজন ছাড়া ওপরে আর কেউ নেই। আভিতা মৃদু হেসে বলল, চল আমরা ঐখানে একটু বসি। সঙ্গর রাজি হলো। দুজনে পাশাপাশি বসল।

সহসা দূর আকাশে দুজনেই একটা অতি উজ্জ্বল দীপ্তি লক্ষ্য করল সেই সঙ্গে গন্ধকের গন্ধ। সমুদ্র উত্তাল হলো। সঙ্গরের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। সে গতরাত্রের মতো আভিতাকে জড়িয়ে ধরতে এলো। আভিতা হাত নেড়ে ডার্নালকে ইশারা করল। কিন্তু ডার্নাল সেখানে পৌঁছবার আগেই এবং সঙ্গর আভিতাকে আলিঙ্গন করবার আগেই আকাশ ফেটে কান ফাটা প্রচণ্ড আওয়াজ, সেই সঙ্গে পাহাড় প্রমাণ ঢেউ যেন জাহাজখানা গ্রাস করে ফেলল। মহাপ্রলয় বুঝি আরম্ভ হয়ে গেল, প্রকৃতি উন্মত্ত হয়ে রুদ্রনাচ আরম্ভ করল।

আটলানটার রাস্তায় রাস্তায় তখনও নরনারীর নাচ চলছিল। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে তারা কোথায় তলিয়ে গেল। কেউ কিছু জানবার আগে সকলে সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে গেল। এই দৃশ্য বর্ণনা করবার জন্যে আটলানটার কেউ বেঁচে রইল না। কেউ হয়তো প্রবল স্রোতে অন্য দেশে ভেসে গিয়েছিল যেমন হোবিট রাশিয়ানরা যার নাম দিয়েছিল আইভান। সমস্ত আটলা-